বিয়ের ফুল

বিমল মিত্র

—: পরিবেশক :—

শ্রীমা বুক সিণ্ডিকেট

২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,

কলিকাতা-৫।

উপহার

—এক—

কাউকে কিছু বুঝে উঠবার সুযোগ না দিয়েই প্রথম ঘুষিটা হাঁকড়েছিল সুনীল।

অজয় চীৎকার করে উঠেছিল সেই সময়, আর লম্বা লোকটা এবারে পাগলের মত সুনীলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীনেনের উচিত ছিল ওদের বাধা দেওয়া, শরীরটা সুস্থ থাকলে তা করতোও সে। কিন্তু সন্ধ্যে থেকেই মেজাজ কেমন ঝিম ধরা হয়েছিল বলেই, মাথার ভেতরটার রক্তের ফোঁটাগুলো চল্‌কে উঠল। পায়ের দিকটা ভারী ভারী, জিভটা শুক্‌নো।

সব মিলিয়ে একটা বিচ্ছিরি ভাব খেলা করছিল। তাই কিছু না ভেবেই দীনেন ধাঁ করে লোকটার হাঁটুতে একটা লাথি মারলো।

সুনীলকে বাঁচানোর জন্য দীনেন লাথিটা মেরেছিল। আর তাতেই গণ্ডগোলটা দানা বেঁধেছিল।

অজয় একবার দু'হাত দুপাশে ছড়িয়ে আটকাতে গেল, পারল না। ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে দেওয়াল ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলালো।

ততক্ষণে ওদের দলের আরো দু'জন হাত লাগিয়েছে। দীনেন তাদের ছুটে আসাটা সময়মত দেখতে পেয়েছিল বলেই, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে হঠাৎ আধখানি বোতলটা তুলে নিলো হাতের মুঠোয়।

তারপর দুজনের মধ্যে রোগাটিকে লক্ষ্য করে একটি লাথি হাঁকড়ালো আর বোতলটা দিয়ে মারল অন্যটার মাথায়। ফট্‌ করে একটা চাপা ধরণের শব্দ হল লোকটার মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো মেঝেতে।

রোগা লোকটির কায়দা মাফিক ঘুষিটা কিন্তু ঠিকমত এসে লাগলো দীনেনের চোয়ালে। এবারে লম্বা লোকটি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। দীনেন হুংকার দিয়ে উঠলো। খুন করে ফেলব শালা··· একা পেয়ে পিক্ দেওয়া হয়েছিল কাল।

ওর হাতের বোতলটা তখনও অক্ষত অবস্থায়ই ধরা ছিল, খালি ভেতরের তরল পদার্থটা ছর ছর শব্দে মেঝের বসে পড়া লোকটার গায়ে পড়েছিল।

জামা কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আর কাঁচা মদের গন্ধ ও রক্তের গন্ধ একসঙ্গে মিশে বেশ ঝাঁঝাল একটা গন্ধের সৃষ্টি করল।

ততক্ষণে ভাটিখানার ভেতর গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। বেঞ্চি থেকে লোকজন উঠে দাড়িয়েছে, কিছু লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চারপাশে।

লুঙ্গিপরা ভাটিখানার ম্যানেজার বীরেনদা ভীড় ঠেলে সরে যান—সরে যান হুংকার ছেড়ে ভিতরের দিকটায় এসে লম্বা লোকটার সার্টের কলার চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর মেঝেতে বসে পড়া লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

দীনেন টের পেল কে যেন তার হাতটা ধরে বাইরের দিকে টানছে, তাকিয়ে দেখল ফ্যাকাসে মুখে বীণা বাইরে বেরুনোর পথ খুঁজছে ভীড়ের ভেতর।

সুনীলকে দেখা যাচ্ছে না। দীনেন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভীড়ের লোকজনকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে, অজয়কে একটা ঝট্‌কা দিয়ে বলল—সর্। আজ একটা এস্পার ওস্পার করে যাবো শালা। বলতে বলতে তার চোখ পড়ল বীরেনদার উপর। অনেকদিনের চেনা লোক, তাদের খাতির যত্নও করে সব সময়।

উঁচু হয়ে বসা অবস্থাতেই ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশের ভীড়টাকে অগ্রাহ্য করে হুকুমের সুরে দীনেনকে বলল—এই দীনেনবাবু কি করছেন, বাড়ী চলে যান না।

এককালে এ তল্লাটে নামকরা গুণ্ডা ছিল বীরেন। দু'একটা খুনের কেসের আসামীও। খবরটা জানতো দীনেনরা। তবু ঐ হুকুমের সুরটা ভাল লাগলো না দীনেনের কানে, আমাদের এই ব্যাপারের মধ্যে তুমি থেকো না বীরেনদা। আমি শালাদের আজ শায়েস্তা করে তবে যাবো।

ওর কথাটা যেন একেবারেই কানে ঢোকেনি, এমনিভাবে আবার বলল বীরেন—বলছি না চলে যান দীনেনবাবু, ঝামেলা বাড়াবেন না আর।

বীরেনের গলার স্বরে কি যেন একটা ছিল। কয়েকজন ভীড়ের ভেতর থেকেই বলে উঠলো—বীরেনদা বলছে যখন চলেই যান না।

দীনেন আবছাভাবে বুঝলো ব্যাপারটা যেন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। ভেতরের আবহাওয়াও কেমন যেন ভেজা ভেজা হয়ে যাচ্ছে।

হাতাহাতিটা শুরু থেকেই কেমন মিয়ানো গোছের ছিল, আজ শুরুতেই সব কিছু ফস্‌কে যাচ্ছে। নেশাটা জমল না ভালোমত, মারামারিটাও না।

অজয় এবার ভরসা পেয়ে দীনেনকে টানতে লাগল—চলে আয় দীনেন, আয় না চলে আয়।

ঠিক আছে, মনে রাখিস আর আমাদের পেছনে লাগলে মজা টের পাইয়ে দেবো। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসবার আগে দীনেন গলা বাড়িয়ে বললে কথাটা।

তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে ভাটিখানার সদর দরজার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল অজয়। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে হাতের বোতলটি খোঁড়া ভিখারীটার হাতে খুঁজে দিলে দীনেন। অন্যদিন দু'চার আনা দেয়, আজ একটু বেশীই দিল, কাউন্টারে ফিরিয়ে দিলে বোতলটা জমার দরুণ গোটা তিরিশেক পয়সা পাবে অন্ততঃ লোকটা আজ।

বাইরে সন্ধ্যের বিশ্রী ধরণের বৃষ্টিটা এখনও তেমনি টিপ্ টিপ্

করে ঝরে পড়ছিল। দস্তা রঙের আকাশে ঘন কালির পোচ্। হাওয়া বইছে পাগল পাগল। সুনীল পানের দোকানের সেডটার তলায় সিগারেট টানছে একমনে। অজয়কে নিয়ে কাছে আসতেই ঠাণ্ডা ভাবে বলল দীনেনকে, শালারা বেশ টিট হয়ে গেছে আজ, আর আমাদের পেছনে লাগতে আসবে না কোনদিন।

দীনেন কোন উত্তর দিলে না তার কথার, মুখটা পানের দোকানের আয়নার কাঁচে একবার বাড়িয়ে ধরে দেখল, কেমন দেখাচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছে এখন, মাথার ভিতর রক্তের চলকে ওঠা ফোঁটাগুলো এতক্ষণে গড়িয়ে গড়িয়ে আবার যথা-স্থানে ফিরে গেছে।

মুখটা ঝাপসা ঝাপসা মতন দেখাচ্ছে, কপালের উপর লাফিয়ে নেমেছে একগোছা চুল। বাঁ পাশের গালে একপোঁচ কালো কালো কি যেন। পকেট থেকে রুমালটা বের করে, মুছে নিল মুখটা ভাল করে, আঙুলগুলো দিয়ে চুলটা কোন রকমে ঠিক করে নিল।

—চল, শা কোম্পানীটা এখনতো খোলা আছে। দু'এক রাউণ্ডে বসা যাবে এখনো। জিভটা দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ঘষতে ঘষতে অজয় বলল—তারপর ?

—তোরা যা আমি বাড়ী ফিরব। আয়না থেকে চোখটা না সরিয়ে বললো দীনেন।

—কেন বাড়ীতে কি কাজ তোর ?

—আছে। জরুরী কাজ একটা আছে।

নেশাটা শুরুতেই চটকে গেল, আর জমবে না আজ জানা আছে দীনেনের। তার উপর যা একখানা মূর্তি ধরে আছে আকাশখানা, কোন সময় যে ছর ছর করে ছাড়বে জানবার উপায় নাই।

আর বাড়ীর পথটাও তো কম নয়। টানা আড়াই ঘণ্টা সমানে স্কুটারে দাবড়াতে হবে। মনে পড়তেই রাগে শরীরটা এক পলকের জন্য চির চির করে উঠতে যাচ্ছিল।

না, বড় বেশী রাগ এসে পড়েছে আজ অকারণে। নেশাটা আজ পুরো হবে না। এই ধরণের হাফ নেশা হ'লেই শরীরে ভীষণ রাগ এসে যায়, ইচ্ছে হয় সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিই।

কিছু ভাল লাগে না তখন। কেন এই জন্ম। কেন এই দিন-যাপনের নির্যাতন। এ সবের কোন অর্থ হয় নাকি, দূর—দূর। এমন কি দোষ ছিল ভাটিখানার লোকগুলোর, যে অমন হাতাহাতি করলুম।

গতকাল সুনীলকে শুনিয়ে শুনিয়ে না হয় দু'চারটে আওয়াজ দিয়েছিল। অমন তো কতই শুনতে হচ্ছে রাস্তাঘাটে আজকাল।

আরে শালা, তোর আমার জন্মগ্রহণটাও তো জীবনের একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, এর মূল্য আছে না কি কিছু? দীনেন ফুট-পাতের ধার ঘেঁষে রাখা ঝরঝরে স্কুটারটা দু'হাতে ধরে ষ্টার্ট দেবার চেষ্টা করল।

প্রথম কয়েকবার যেমন গাড়ী তেমনি রইল। শুধু ভারী পাটা অবশ অবশ লাগলো খানিক। তারপর আচমকা ফট্ ফট্ শব্দ করে উঠল গাড়ীটা। দীনেন আর এক মুহূর্ত দেরী করল না, লাফিয়ে উঠে বসল সিটে, ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—চলিরে, কাল পারলে দেখা করবো।

চলতে চলতে বাঁক নিয়ে রাস্তায় নামলো। সারা রাস্তা জুড়ে বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দ। ট্রাম-বাস মোটর গাড়ীর শব্দ। দীনেনের ঝরঝরে স্কুটারের আওয়াজ সব শব্দকে এক নিমেষে ডুবিয়ে দিয়ে ছুটলো তীরবেগে।

রেণ্‌কোট পরা ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাতের তলা দিয়ে ছুটে যাবার সময়, সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম মনে পড়লো তার, আজ বীণার জন্মদিন।

সকালে বেরুনোর আগে বার বার করে মনে করিয়ে দিয়েছিল, সকাল সকাল যেন দীনেন আজ ফিরে আসে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান আছে।

বীণার বয়সের ঐ সব কিশোরী মেয়েগুলোকে নিয়েই যত মুস্কিল। বড় বিচ্ছু ধরণের হয় ওরা। বড্ড বেশী অভিমানী আর সরল।

ওর দিদি রমার যদি আজ জন্মদিনের ব্যাপার থাকত, তাহ'লে এত মুস্কিলে পড়তে হ'ত না দীনেনকে। কোন একটা জরুরী কাজের কথা বানিয়ে বলে দিলেই অনুপস্থিতির ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু বীণাকে কোন কিছু বলেই পার পাওয়া যাবে না। ঠোঁট ফুলিয়ে যা মুখে আসবে তাই বলে বসবে, আর বেশী রেগে বলা যায় না, হয়ত দু'একটা কিলও মেরে বসতে পারে তার পিঠে।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিতেও কলেজ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি আসতেই পুরোপুরি ভিজে গেল দীনেন। বিকেলে অফিস থেকে বেরুনোর সময়ই চোখে পড়েছিল আকাশটার কোথাও একটু কালো কোথাও ধূসর কোথাও বা লাল রঙকরা মেঘ ছিল।

দীনেন তেমন খেয়াল করে দেখেনি। তবু যেন চোখে পড়েছিল। যতই দ্রুত পথটা পার হচ্ছিল ততই যেন মনে হচ্ছিল এ পথ বুঝি সে আর অতিক্রম করতে পারবে না। কোথাও থেমে যেতে বাধ্য হবে আজ।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে আসতেও অনেক সময় গেল। কয়েকবার ট্রাফিকের লাল আলো তাকে থামালো, বাস বা ট্রামের হিজিবিজির মধ্যে পেছন রাস্তায় স্কুটারটা একটু সাবধানেই চালাতে হচ্ছিল বলে স্পীড বাড়াতে পারছিল না সে।

তারপর গোলাকার বিপজ্জনক বাঁক পেরিয়ে ব্রিজটার মুখে গাড়ী থামতেই মনে হ'ল এবার গাড়ীর স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দিলেও ক্ষতি হবে না। উৎসাহিত হয়ে দীনেন স্কুটারের স্পীডটা বাড়াতে গেলে, ধাঁ করে সামনে পড়ল পর্বত-প্রমাণ খড় বোঝাই লরীটা। ঠিক সময় ব্রেকটা চাপতে পারল বলে গাড়ীটা একবার লাফিয়ে উঠেই থেমে গেল। বুকের ভেতরটা এক মুহূর্তের ভেতর নাড়া খেয়ে একেবারে তছনছ হয়ে গেল।

দূর শালা···আর একটু হলেই দীনেনবাবু একেবারে অক্কা।

কথাটা মনে পড়তেই দুর্বল ভাবে হাসলো দীনেন। চকিতে মনে পড়ল সন্ধ্যেবেলার ভাটিখানার লোকগুলোকে সে আঙুল তুলে শাসাচ্ছিল আর কখনও অমন করলে লাস ফেলে দেবো, অথচ আজ যে তার নিজেরটাই যেতে বসেছিল ।

ব্রিজটা পার হয়ে আসতেই দীনেন কেমন এক আক্রোশ অনুভব করল। হয়ত অনেকক্ষণ থেকেই ক্রমশ কোন ক্ষোভ তার মনে জমছিল। মেঘলা জলে আজকের মতন গুমোট ভাব।

নাড়া খেয়ে সেটাই বুক ভরে ছড়িয়ে গেল যেন। শালা ফট্ করে মরে গেলে এই সংসারে কার কি বা এসে যেতো, বাবা মা তো সেই কোন ছোটবেলাতেই মরে গেছে, সংসারে আত্মীয় স্বজন বলতে কারা যে, তারও কোন হদিশ রাখে না সে।

এই বছরখানেক তবু বাবার বন্ধু বিনয়বাবুর সংসারে থাকতে এসে একটা ঘর গেরস্থালীর স্বাদ পাচ্ছে, তার আগে তো রাঁচির সেই ইস্কুল কলেজের বোর্ডিং-এর জীবন কাটিয়েছে, তারপর সেখান থেকে পাগলামি করে সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে একটানা পাঁচ বছর।

তারপর সেখান থেকে এ্যাডভারটাইজিং কোম্পানীর আর্টিষ্টের চাকরি।

নিজের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে মনটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল দীনেনের। এত কষ্ট হচ্ছিল নিজের জন্য, এত মায়া জাগছিল যে নিজের গায়েই স্নেহের হাত রেখে বলতে ইচ্ছে করছিল, তার তাতে কি? এ সংসারে কতজনেরই তো বাবা মা আত্মীয় স্বজন থাকে না, তাই বলে এত দুঃখ পাওয়ার কি আছে?

স্কুটারটা অনেক দূরে এসে পড়েছিল। তাকে পাশ কাটিয়ে, তার সামনে দিয়ে আরও কত মাল বোঝাই লরী, বাস, মোটর চলে গেল।

দীনেন লক্ষ্য করল না, অন্যমনস্কতার দরুণই সে কখন নিজের অজ্ঞাতেই স্কুটারের গতিটা কমিয়ে দিয়েছে।

ভেজা বাতাস চারপাশ থেকে হু হু করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তার উপর জলে ভিজে জামা প্যাণ্ট শপ্ শপ্ করছে, আর কোথায় কোন গোপন স্থান থেকে একটা শব্দ হচ্ছে গোঙানীর মত।

যেন কেউ দীনেনের পাশে পাশে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলেছে। অসহ্য মনে হওয়ায় গাড়ীর স্পীডটা বাড়িয়ে দিল দীনেন।

একটা সিগারেট খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল তার। কেমন একটা খাঁ খাঁ করা ভাব এসেছে, জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। কেন —এমন হচ্ছে কেন? দীনেন হঠাৎ টের পেল সে ঘোরা পথটায় এসে পড়েছে, এই পথে বাড়ী পৌছতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে আজ। ক্রোধ, তিক্ততা, আক্রোশে যেন আচমকা দীনেনকে কেমন বেপরোয়া করে তুলল।

পায়ের ও হাতের চাপ বাড়িয়ে হ্যাণ্ডেল দুটো ধরল শক্ত মুঠোয়।

তারপর মনে মনে যেন অদৃশ্য কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে নামবার দৃঢ়তা নিয়ে প্রচণ্ড জোরে রাস্তায় স্কুটারটার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

লক্ষ্য স্থির ও তীক্ষ্ণ রেখে শরীরের অঙ্গগুলোকে অস্বাভাবিক কঠিন করে, এরপর বেপরোয়া ভাবে সে পথ অতিক্রম করছিল, এই সংসারে নিঃসঙ্গ একাকী বলেই সকল কিছুর উপর গোপনে তীব্র অভিমান জাগছিল তার।

সে যেন সেই মুহূর্তে মন থেকে রমাকেও মুছে ফেলতে চাইছিল। পেট্রোল পাম্পের বাঁকটা পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় নামতেই দীনেন কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলো।

আর মাইলখানেক পথ। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছিল বলে মনে হচ্ছিল তার। বাতাসটা যদিও তেমনই পাগল পাগল বইছিল, তবু মুখে চোখে আর আগের মত জলের ঝাপটা লাগছিল না।

ছেলেমানুষের মত দীনেন নিজের ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ মনটাকে বশে আনবার চেষ্টা করল। গাড়ীর স্পীডটা কমিয়ে এনে কায়দা করে ভেজা শার্টের হাতায় মুখটা মুছে নিল। আধখেঁচড়া নেশাটা অনেকক্ষণ আগেই কেটে গিয়েছিল বলে, ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছিল তার।

সামনে বড় দোকানটায় তখনও আলো জ্বলছে মিট্‌মিট্ করে। পাশের মন্দিরটা অন্ধকার। জনকয়েক দোকানের চৌকিতে লণ্ঠনের আলোয় তাস খেলছে।

দীনেন দোকানের সামনে এসে স্কুটারটা দাঁড় করাল। সেডটার তলায় এসে পকেট থেকে রুমাল বের করে, মুখ, গলা ভালো করে মুছল।

একেবারে ভিজে গেছেন যে দাদাবাবু! হাতের তাস নামিয়ে দোকানী শঙ্কু হাসল।

এক প্যাকেট সিগারেট দাও তো, আর একটা দেশালাই।

শঙ্কুর দোকানটা পাঁচমেশালী ধরণের, মনোহারী জিনিষ পত্রের সঙ্গে তেল নুনও পাওয়া যায়। পান সিগারেটের খোপটা একধারে।

দীনেন একটু এগিয়ে গিয়ে কাঁচের বড় শোকেসটার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো। কম দামী খেলনা-পাতি, স্নো, পাউডার থেকে শুরু করে হরেক রকমের জিনিষপত্র সুন্দর করে সাজানো, দু'চারটে দামী শৌখিন জিনিষও আছে।

ভেতরের জিনিষগুলো দেখতে দেখতে দীনেনের মনে পড়ল বীণার জন্মদিনের উপহার হিসাবে কিছুই কেনেনি সে।

ভাটিখানা থেকে বেরুনোর পর মনে করেছিল শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার দোকানগুলো থেকে কিছু একটা কিনে নেবে। কিন্তু তখন বৃষ্টি আর বাড়ী ফেরার তাড়ায় এতই ব্যস্ত ছিল যে, আসল জায়গায় কথাটা মনে পড়েনি একদম।

তখন শো-কেসের জিনিষগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল

আর নানা জিনিষের ভিড়ের ভেতর চোখে পড়ল রূপোর কাজ করা একটা আতরদানী।

শঙ্কুর দোকানে এমন ধরণের সৌখিন জিনিষ আশা করাই যায় নি। জিনিষটা দূর থেকে আবছা মতন দেখেই দীনেনের বেশ ভাল লেগে গেল।

—কিছু নেবেন নাকি বাবু?

—হ্যাঁ, ঐ আতরদানীটা একবার বের করতো—দেখি।

—তা নিন না, ভালো জিনিষ। বলতে বলতে উৎসাহিত হয়ে শঙ্কু তক্তপোষটা থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে এলো, ফিতেটা ঘুরিয়ে অনেকটা উজ্জ্বল করে দিয়ে রাখল শো কেসটার উপর, তারপর উঁচু হয়ে মেঝেতে বসে শো কেসের ঢাকনাটা খুলতে লাগলো।

দূর থেকে যেমন লেগেছিল, চোখের কাছে আসতেও জিনিষটা মন্দ লাগল না দীনেনের। সুন্দর জয়পুরী কাজ করা ছোটখাটো রূপোর আতরদানীটা, একটু যা ধুলো লেগেছে, তা ছাড়া সব ভালো।

শঙ্কুকে বলতে সে ব্যস্ত হয়ে নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে আতরদানীটা পরিস্কার করতে লেগে গেল।

জন্মদিনের উপহার হিসাবে জিনিষটা বেশ ভালোই। মেজ কাকীমারও খুব একটা অপছন্দ হবে না। যা খুঁতখুঁতে স্বভাব ভদ্রমহিলার।

এক পলক ভাবল দীনেন। চিরকাল ধনী বাপের আদরে আদরে মানুষ, নিজের মেয়েদেরও শিক্ষা-দীক্ষা দিচ্ছেন তেমনি।

বিনয় কাকাবাবু কিন্তু অন্য ধরণের লোক, যেমন বেপরোয়া বাউণ্ডুলে স্বভাবের। সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীতে তেমন মন বসে না।

উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ান কেবল, মাসের মধ্যে বেশীর ভাগ দিনই কলকাতার নিজস্ব ফ্লাটে কাটে তাঁর। তাই নিয়ে সংসারে অশান্তির শেষ নাই।

যতসব বড়লোকের কাণ্ড। দীনেন জিনিষপত্রগুলোর দাম চুকিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি দোকানের বাইরে এলো, রাত বাড়ছে।

শঙ্কুর ঘড়িতে যখন এগারোটা বেজেছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা বা তার কিছু বেশী হবে।

আতরদানীটা বেশ অল্পদামেই ছেড়ে দিয়েছে আজ শঙ্কু, অনেকদিন শো-কেসে পড়েছিল বিক্রী হয়নি।

কাগজ দিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, সবচেয়ে ভালো হ'ত আতরদানীটায় খাঁটি আতর খানিকটা ভরে দিতে পারলে।

এবার ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িটায় ষ্টার্ট দেবার চেষ্টা করল দীনেন। সে বেশ অনুভব করতে পারছিল তার মনে তখন আর অহেতুক জ্বালার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই।

মনের ভারটা কেটে গিয়ে ভেতরটা খানিকটা বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। বিষণ্ণতার বোধটা অবশ্য থেকে যাচ্ছে, থাকুক।

হয়ত আস্তে আস্তে কোনদিন এটুকুও চলে যাবে। সেই সময় ভীষণভাবে রমাকে মনে পড়ছিল তার। আশ্চর্য ঐ এক মেয়ে।

বহু পুরাণো বিখ্যাত পেণ্টারদের এ্যালবামে এক ধরণের ক্ল্যাসিকাল সুন্দরীর দেখা পাওয়া যায়, সেই ধরণের মুখশ্রী, কি নিখুঁত খোদাই করা মুখ চোখের ছাঁদ, টানটান শরীর, আর আশ্চর্য লালে সাদায় মেশানো গায়ের রঙ। কি সম্ভ্রান্ত রাজকীয় চালচলন।

শিথিল ভঙ্গীতে গাড়ি চালিয়ে দীনেন রমার কথা ভাবতে ভাবতে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। আশ্চর্য বহুবার লক্ষ্য করে দেখেছে যে ঐ রমার কথা ভাবতে গেলেই ভেতরে ভেতরে নিজেকে কেমন ছোটো তুচ্ছ বলে মনে হয় তার।

বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত ব্যাথায় মুচড়ে ওঠে। অথচ ঐ ভাবনায় এক ধরণের গোপন সুখও যেন আছে। যেন অলৌকিক এক ধরণের মোহাবেশ।

ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না কখনও। অনেক সময় মনে হয়েছে দীনেনের, কোনো জাগতিক চাওয়া পাওয়ার তালিকায় যেন কিছুতেই চেনা যায় না রমাকে। ও যেন বড় দূরের কিছু একটা। কোন একজন।

দূর থেকেও দীনেন বেশ স্পষ্ট বিনয়কাকার পাঁচিল ঘেরা বিরাট বাড়িটার লোহার উঁচু গেটটা দেখতে পাচ্ছিল।

বাড়ীর কোথায় আবছা মতন একটা আলো জ্বলছে। কাছে আসতে গাড়ীর লাইটটা নিভিয়ে দিল সে তারপর ষ্টার্টটা বন্ধ করল আস্তে আস্তে।

বিরাট ভারী লোহার গেটটা খুলে দীনেন স্কুটারটা ভিতরে আনলো। নিজের হাতে সব করতে হচ্ছিল বলে বেশ খানিকটা পরিশ্রম হচ্ছিল তার। এতক্ষণ পর খিদের ভাবটাও টের পাচ্ছিল সে।

বিকেলে ভাটিখানায় ঢোকবার আগে একটা কাটলেট খেয়েছিল মনে পড়ল। বাগানটা থমথমে, খোয়ায় ঢাকা পথের দুপাশে ছোট ছোট ঝোপ, কেয়ারী করা ফুলের বাগান, আউট হাউসটার একধারে একটা পলাশ, পেছনে মিষ্টি তেঁতুলের গাছ।

গাছের পাতা থেকে জল গড়িয়ে পড়ার একটা শব্দ হচ্ছিল। তীব্র কোন ফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগছিল।

দিনেন আউট হাউসের বারান্দায় উঠে স্কুটারটা রাখল দেওয়ালের ধার ঘেঁষে।

দারোয়ানের ঘরটা অন্ধকার। গরমের দিনে এ সময় বাগানে খাটিয়া পেতে আড্ডা জমিয়ে তুলে রামসিং। আজ বাদলা পড়ায় তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেছে।

বারান্দায় আলো ছিল না। দীনেন নিজের ঘরের দরজাটার কাছে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলবার আগেই তার হাতের ধাক্কায় ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

অবাক হলো সে। আলোটা জ্বলছে ঘরের মাঝখানে, খাটের বিছানার উপর আসন পিঁড়ি করে বসে বীণা।

এতক্ষণ একটা বই পড়ছিল ঝুঁকে পড়ে, দরজা খোলার শব্দে চোখ তুলে তাকিয়েছে। দীনেন বুঝল তার ঘরে 'খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবার জন্য সেজ কাকিমার কাছে যে ডুপ্লিকেট চাবিটা থাকে, সেটা দিয়েই তালাটা খুলছে ও।

দীনেন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বেশ প্রফুল্ল গলায় বলল, খুকু-মণি জেগে ?

বীণা যে সুন্দরী তা নয়। মা বা দিদির নাক মুখের ছাঁদ বা গায়ের রঙ কিছুই পায়নি ও। কি আশ্চর্য এক টলটলে লাবণ্য আছে ওর চোখে মুখে দীঘল লম্বা গড়নে।

হাল্কা শরীরে ঝকঝকে স্বাস্থ্য, ঐ বয়সী মেয়েদের যে ধরণের এক রকম পবিত্রতার দাগ থাকে, যা দেখলে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

ভীষণ লোভ হয় ফুলের উপহার দিয়ে ওদের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ জমাতে, তেমনি মনে হচ্ছিল দীনেনের ঝলমলে পোষাকে বীণাকে দেখে। অন্য সময় অমন মনে হয় না। আবেশটা নূতন বলেই এতক্ষণ পর দীনেনের ভেতরটা বেশ ঝরঝরে লাগল।

—তুমি এত দেরী করলে কেন ?

স্থির চোখে রাজহংসীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে বীণা বলল গম্ভীর গলায়।

—আরে বল কেন, বাড়ী ফিরব বলে বেরিয়েছিলাম ঠিক সময়ই, কিন্তু রাস্তায় বৃষ্টিতে আটকে যেতে হলো। চট করে মুখে সহজ মিথ্যেটা এসে গেল বলে, দীনেন স্বস্তি অনুভব করল। ভেবে চিন্তে বানিয়ে বলতে গেলেই গণ্ডগোল হয়ে যেত।

—ভেজা পোষাক ছেড়ে ফেল শিগ্‌গীর।

হুকুমের সুরে বলল বীণা। দীনেন চোখের কোণটা দিয়ে একবার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখল, ওর মুখের থমথমে ভাবটা এখনও কাটেনি।

তবে একটু একটু করে হাল্‌কা হয়ে আসছে। বেশ একটা মজা লাগলো তার।

দীনেন খাটের তলা থেকে চটিটা খুঁজে পায়ে গলিয়ে নিল। আর বাথরুমে যাবার আগে ঘরের জানালা খুলে একবার বাইরেটা দেখে নিল।

আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, ভিজে ও মিহি রঙের একটা আলো ফুটতে শুরু করেছে।

সামান্য পরেই ফিরল দীনেন। ততক্ষণে বীণা নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে মেঝেতে পা ঝুলিয়ে বসেছে।

টেবিলের উপর রাত্রির খাবারটা ঢাকা দেওয়া। ঢাকাটা তুলেই নানা ধরণের খাদ্যবস্তু দেখে দীনেন বীণার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল।

তারপর কি একটা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

ভেজা প্যান্টের পকেটে আতরদানীর প্যাকেটটা রয়ে গেছে। জিনিষটা বীণার হাতে দিতে দিতে বলল—ছাখো তো জিনিষটা কেমন ?

আর তখনই ভালো করে চোখ পড়ল তার বীণার উপর। এতক্ষণ দেখেনি এবার দেখল, জন্মদিনের নূতন সাজ সজ্জাটা, চুল বাঁধার নূতন ধরণটা, কপালে চন্দনের ফোঁটাগুলো মুছে গেছে, তবু দু' এক মুহূর্ত বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়ে রইল দীনেন।

অপরূপ দেখাচ্ছে আজ বীণাকে, নূতন সাজ সজ্জায় একটু যেন বড় বড়ই লাগছে। দীনেন অস্ফুট স্বরেই বলল, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে বীণা আজ।

—তুমি আজ আমাকে কিন্তু ভীষণ কষ্ট দিয়েছো দীনেনদা।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল সে তারপর। আর মাথাটা নীচু করে উপহারের প্যাকেটটা বুকে আঁকড়ে ধরে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দীনেন বীণার দৌড়ে যাওয়া পায়ের আওয়াজ শুনল। তারপর ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গেল।

চকিতে ঘটে গেল যেন ব্যাপারটা, ভালো করে বুঝল না, দীনেন স্তব্ধ হয়ে ঘরের চৌকাটে দাড়িয়ে রইল খানিক।

—দুই—

রাত্রে বিছানায় শুয়ে দীনেন রমাকে স্বপ্নে দেখল। একটা চক্রাকার পথ রমাকে যেন তার কাছ থেকে দূরে দূরে টেনে নিয়ে চলেছে। দীনেন দু'পায়ের দৌড়ে সেই দূরত্বটা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল বারবার, কিন্তু পথটা প্রতিবারই গোটানো সূতোর মত খুলে খুলে তার চারপাশে এক জটিলতার সৃষ্টি করল।

তারপর হতাশ ক্লান্ত দীনেন একসময় পথের মাঝখানে দাড়িয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তার।

আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দুটো ছুঁয়ে কান্নার জলের গড়িয়ে আসা ফোঁটা দুটো অনুভব করলো সে।

স্বভাবতই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠতেও দীনেনের কোনও আগ্রহ হলো না। বরং শুয়ে আরো কিছুক্ষণ ধরে সে কান্নার ফোঁটা দুটোকে মাথার বালিশের উপর গড়িয়ে যেতে দিল, বুকের ভেতরের কষ্টটাকে ফুঁ দিয়ে নেভাতে চাইল।

বুকের ভেতর থেকে কষ্টটা তার মারবেলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত যাতায়াত করল কয়েকবার। দীনেন ভাবল, প্রেমের ব্যর্থতা তো নয়, রমা যে কোনো রকমের কোন সুযোগই দিল না তাকে। প্রথম দেখার দিন থেকেই যে আজ মনে মনে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে তুচ্ছ, নগণ্য হয়ে রইলাম। ওর সঙ্গে আমার সবদিক থেকেই যে কি সুগভীই দূরত্ব সেই কথা ভেবে ভেবেই কেবল ছোট হয়ে যেতে থাকলাম।

বিষণ্নতার পর কেমন অবসাদে ভরে গেল দীনেন। মাঝে মাঝে এই এক ধরণের অবসাদ বোধ করে সে। কি যেন এক গুরুভার শরীর ও মনকে এমন এক অবস্থার মধ্যে টেনে আনে, যখন এই সংসারের প্রতিটি বিষয় দীনেনের কাছে মূল্যহীন ফাঁকা হয়ে যায়।

আরও কিছুক্ষণ দীনেন চুপচাপ শুয়ে থাকল। রমার কথা ভাবতে গিয়ে কাল রাত্রের বীণার ঐ অদ্ভুত আচরণটাও মনে পড়ল, অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ওর মোরামের পথ ধরে ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটাও যেন ঝাপসা হয়ে ভেসে উঠল।

শেষে দীনেন অকারণেই চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। খালি মুখের ভেতরটা কেমন তেতো তেতো হয়ে আছে। গত রাত্রের ভাটিখানার মারামারির ব্যাপারটাও তার মনে পড়েছিল সময়ে। ঘরের দরজাটা বন্ধ, খোলা জানালা দিয়ে রোদ আসছে গল গল করে।

তাক থেকে ছোট টুথব্রাসটা নিয়ে বাথরুমে যাবার আগেই দীনেন শুনল বন্ধ দরজার ওপাশে দারোয়ানের গলা।

রাম ডাকছে তাকে। নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রয়োজন তা না হলে এই সময় ওর ডাকবার কথা নয়। ভ্রু কুঁচকে বন্ধ দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একটু বিরক্তও বোধ করল সে।

সকাল বেলাটায় শান্ত ধীর ভাবেই কাটানোর অভ্যাস তার চিরকালের। কোনো রকমের ঝামেলা বা উত্তেজনার প্রশ্রয় দেয় না। সে সচরাচর দিনের এই সময়টা। বরং খানিকটা অলসভাবেই মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করে। দরজা খুলেই দীনেন দেখল রাম-সিং এর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

এই বাবুজী আপনাকে খুঁজছিলেন।

আসুন।

দরজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটির ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল সে।

—একটা কাজে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

—না, তা কেন বলুন।

বলতে বলতে হাতে ধরা টুথব্রাস আর পেস্টের কথা মনে পড়ল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে দীনেন। তারপর বলেই ফেললো।

—খুব তাড়াতাড়ি না থাকলে একটু বসুন। আমি এই কাজগুলো সেরে নিই। বলে হাতের জিনিষগুলোকে তুলে ধরে আবছাভাবে হাসল দীনেন।

আমার তেমন তাড়া নেই কাজটা সেরে আসুন আপনি।

সামান্য পরেই ফিরল সে। ততক্ষণে শ্যাম বিছানাটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। ঝাঁট দিয়ে সাফসুফ করেছে ঘর, জানালাগুলো একে একে খুলে দিচ্ছিল। দীনেন ওকেই লক্ষ্য করে বললো।

—চা কিন্তু দু'কাপ আনিস।

তারপর ভেজা মুখেই চেয়ার টেনে বসল মুখোমুখি।

—বলুন তো কি ব্যাপার?

বিরক্ত হবার বদলে বেশ প্রফুল্লই লাগছিল দীনেনকে।

—আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইতে এসেছি। তার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই।

—শ্যামল ঘোষ আমার নাম। বছর খানেক হলো কলকাতায় এসেছি।

—আগে পূর্ববাঙলার দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা করতুম। এখন কলকাতার ইউনিভারসিটিতে একটি রিসার্চের কাজ করছি? বিমলদের মেসে থাকি ওর কাছেই আপনার নাম শুনলাম।

—আপনার মতো মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। বিনম্রভাবে দীনেন বলল।

—আরে না না মশাই, তেমন কিছু নই আমি। বিমলের কাছে আপনার কথা শুনলাম। যদিও আপনার পরিচয় আমি বিভিন্ন পত্রিকায় ইলাস্ট্রেশন বা বুক-কভার থেকেই জেনেছি।

—ও আর কি।

—না মশাই, তা বললে শুনবো না। আপনার কাজ আমার ভীষণ ভাল লেগেছে।

দীনেন নীরবে হাসল, তারপর টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল।—আসুন।

—ওটা চলে না আমার।

দীনেন কিছু বলল না, একটা সিগারেট ধরালো, এক গাল ধোঁয়া টেনে নিয়ে ঢোক গিলল। পরে শ্যামলের পোষাক লক্ষ্য করে বললো,—আপনার কাজটা কি কমার্শিয়াল ধরণের কিছু ?

—এই মানে আপনাকে একটা কবিতার বইএর কভার এঁকে দিতে হবে। আমারই এক বন্ধুর বই, ও বছর খানেক হল মারা গেছে পাকিস্তানের জেলে। বলতে বলতে শেষের দিকে শ্যামলের গলার স্বরটা কেমন হয়ে এল।

—আমার ছোটবেলার বন্ধু, একসঙ্গে স্কুল কলেজে পড়েছি ! ভাষা আন্দোলন করেছি। ধরা পড়বার পরও জেলের ভেতরে আন্দোলন চালাচ্ছিল, ওকে জেলে ঢুকেই গুলি করা হয়েছিল। যদিও সরকারী বিবৃতিতে অন্য কথা বলা হয়েছে।

একটু থেমে থেমে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কথা বলছিল শ্যামল এবার। দীনেন বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

একটু আগেও ভদ্রলোককে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল, এখন সেই মুখটাই কেমন ভাঙাচোরা মনে হ'ল।

—ঐ রহিমের বইএর কভারটা আপনাকে এঁকে দিতে হবে দীনেন-বাবু।

এতদিন বিভিন্ন জায়গায় ওর কবিতাগুলো সব ছড়িয়েছিল বলে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখন ছাপা শুরু হয়ে গেছে। মাস খানেকেই ছাপার কাজ শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে।

দীনেন কিছু বলল না। একজন মৃত বিপ্লবী কবির বিষয় শুনতে শুনতে সে যেন অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলো।

—কাজটা কিন্তু আপনাকে একটু তাড়াতাড়িই করে দিতে হবে। আমাদের লোক ওখানে যাবে দিনকয়েকের মধ্যেই, ওর হাতে ব্লকটা পাঠাতে চাই।

—যদিও কাজটা ওখানেও করা যেত, কিন্তু অসুবিধা হলো আমাদের দলের লোকজন এখন একটু ছত্রভঙ্গ হয়ে আছে। ভীষণ গোলমাল চলছে তো।

এই সময় খাবারের প্লেট আর চা নিয়ে এলো শ্যাম। শ্যামলকে বেশী সাধাসাধি করতে হলো না, সহজ ভাবেই সে দীনেনের খাবারের থেকে নিজের ভাগটা নিয়ে নিল।

—রহিমের কবিতার চরিত্রটি আপনাকে একটু বলি, ফাইল কপি-গুলো এখনও আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি। তাহলে আপনি নিজে পড়ে বুঝে নিতে পারতেন।

ওর নিজের চরিত্রের মতই রহিমের কবিতার মেজাজটাও খানিকটা খ্যাপাটে বাউল ধরণের। ভাষা ও চিত্রকলার ব্যবহারগুলো অনেকটা জীবনানন্দের রূপসী বাংলার ভাষা ও চিত্রকলার মত। পূর্ববাংলার নিসর্গ মানুষের অন্তরঙ্গ ছবি হল ওর কবিতা। প্রত্যেকটি কবিতার বিষয়ও একটি বাংলাদেশ।

খুব আবেগের সঙ্গে কথা বলছিল বলে শ্যামলের গলার স্বর বেশ গমগমে আর সুরেলা শুনালো।

দীনেন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। এবার আবেগটা কেটে যেতে মজুক ধরণের একটু হেসে মুখ নীচু করল, তারপর মুখ তুলে বলল।

—বুঝতেই পারছেন, রহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তাই ওর কথা বলতে গিয়ে একটু বেশী কথা বলা হয়ে যাচ্ছে আমার, কিছু মনে করবেন না দীনেনবাবু।

—আরে না, একি বলছেন আপনি, আমার খুব ভাল লাগছে ওর কথা শুনতে।

আন্তরিকভাবে বলে উঠলো দীনেন।

—মানুষটাকে দেখলে বুঝতেন ওর বিষয়ে একথা হাজার কথা বললেও শেষ হয় না। আপনার যখন ভাল লাগছে শুনতে, তখন একদিন না হয় রহিমের গল্প করা যাবে। আজ একটু কাজ আছে উঠতে হবে।

ছটফটে ভঙ্গিতে শ্যামল চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল, বারান্দায় পায়েব শব্দ শুনে দীনেন চোখ ফেরালো।

সেজ কাকিমা ঘরে এলেন। সকালের দিকে তার আটপৌরে সাজ-সজ্জা থাকে, তবু সেটাও কম দ্রষ্টব্যের নয়।

তিনি ঘরে ঢুকতে একটা ফিকে মিহি ধরণের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। দীনেন তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সচরাচর তিনি দীনেনের ঘরে পা দেন না, কোন কথা বলার থাকলে নিজস্ব আয়াকে দিয়ে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান।

দীনেনের দেখাদেখি শ্যামলও ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সেজ কাকিমা তার দিকে খানিক অপলক তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুত হলেন।

দীনেনের মনে হলো খুব গোপন জরুরী কথা তিনি বলতে এসেছিলেন তাকে। ঘরে লোক দেখে একটু বিরক্ত হলেন।

সে আর দেরী করল না, শ্যামলের সঙ্গে কাকিমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল চুপ করে একটা প্রণাম করে বসল তাকে। তিনি এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন।

—থাক থাক, ঠিক আছে বাবা, বলে তার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসলেন।

—একদিন আমার কাছে এসো, তোমার সাথে আলাপ করবো।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে, দীনেন তার পিছনে বারান্দায় এলো।

—আমাকে কিছু বলবেন কাকিমা ?

—হ্যাঁ দীনেন, আজ একবার তোমার কাকাবাবুর খবরটা নিও তো। কাল বীণার ফাংশানে এলেন না বা কোন খোঁজও করলেন না।

চাপা গম্ভীর ধরণের গলায় কথাগুলো বললেন। কাকীমা যে বেশ রেগে গেছেন তা তার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ল।

—ঠিক আছে। অফিসে যাবার আগেই ওর খোঁজ নিয়ে ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

—অত তাড়াতাড়ি করার কিছুই নেই, সময়মত খোঁজটা নিলেই হবে।

কাকিমা বাগানের দিককার পথে পা বাড়ালেন, তারপর কি যেন একটা কথা মনে পড়ায় ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—তোমার উপহারটা কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে, বেশ ওরিজিন্যাল। বলে ফিকে ধরণের একটা হাসি ঠোঁটে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

দীনেন বারান্দায় দাড়িয়ে এক মুহূর্ত বিনয় কাকাবাবুর কথা ভাবল। ওর জীবনের কথাটা ভাবলেই অদ্ভুত লাগে দীনেনের, কেমন একটা জট পাকানো ব্যাপার বলেই রহস্যময় লাগে। তারপর ঘরে ঢুকে দেখল, শ্যামল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

—আপনি রাজী তো দীনেনবাবু। দেখবেন একটু তাড়াতাড়ি যেন হয়।

—ঠিক আছে, দুটো দিন সময় নিলাম আমি, রবিবার হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন, আড্ডা দেওয়া যাবে।

—তাহলে তো বেশ ভালো হয়।

নমস্কার করে শ্যামল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীনেনও তার পেছনে পেছনে এগিয়ে দেবার জন্যে গেল গেট পর্যন্ত। গেট পার হয়ে

কয়েক পা এগিয়েই কিন্তু ফিরে এল শ্যামল। দীনেন গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

—একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, রহিম লাল আর হলুদ রঙটা ভীষণ পছন্দ করতো, দেখবেন যদি সম্ভব হয় প্রচ্ছদে ঐ রঙ দুটো ব্যবহার করবেন।

শ্যামল কথাটা বলে চলে গেলেও, নরম রোদের ভেতর সামান্য দাঁড়িয়ে থাকলো দীনেন। শ্যামলের আসার জন্য মনটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল তার। চিরদিনই দেখেছে দীনেন এই ধরণের রাজনীতি করা মানুষগুলোই অদ্ভুত ধরণের হয়। বাইরের দিকটা কাঠখোট্টা ধরণের, কিন্তু ভেতরটা বড় কোমল। পৃথিবীর যাবতীয় তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করেই পাগলের মত একটা আদর্শের পেছনে ছুটে বেড়ায়, সেজন্য জীবন দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। দীনেন রহিমের কথা ভাবছিল, পুলিশ যাকে জেলখানার ভেতর ঢুকে অসহায় অবস্থায় গুলি করে মেরেছিল।

তার কথা ভাবতে গিয়ে দীনেনের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। এই সময় বাগানের ভেতর রমাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে থমকে দাড়ালো।

বাচ্চা মালিটাকে ফুল গাছের বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল সে। দীনেনের চোখে চোখ পড়ায় আবছা করে হাসল রমা। তারপর দৃষ্টি ফেরালো অন্যদিকে। দীনেন চোখ তুলে রমাকে এক পলক দেখলো।

বর্ষা ফুরিয়ে আসছে ক্রমশঃ! আকাশের রঙ বদলাতে শুরু করেছে।

ধোয়া মোছা হালকা নীলের ছাপ ধরেছে, রোদের তেজটা নরম হয়ে আসছে, শীত এসে গেল বলে।

যতটুকু সময় দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দীনেন রমাকে। তারপর ফুলের রাজ্যে। সেই সময় বুক থেকে তার চাপা নিঃশ্বাস বেরুলো।

তারপর পায়ে পায়ে সে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

যদিও দীনেনের হাজিরা দেবার বিষয়ে তেমন কড়াকড়ি নেই, তবু বিনয় কাকাবাবুর ফ্ল্যাট ঘুরে যেতে কিছু সময় লাগবে, বলে বাড়ী থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরুন উচিত তার আজ। ফলে আর এক মুহূর্তও দেরী করলো না সে।

কিছু পরে দীনেন যখন অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে স্কুটারে চেপে বসল, তখন তাকে বেশ চকচকে দেখাচ্ছিল।

সদ্য দাড়ি কামানো মুখ, পাট করা ঢেউ খেলানো চুল, হাল্কা রঙের শার্ট আর কালো ট্রাউজারে তাকে অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী সুন্দর লাগছিল।

আয়নায় সেটা টের পেয়ে দীনেন স্কুটারটা গেট দিয়ে বের করে আনবার সময় বেশ কয়েকবার আড়চোখে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল।

যদি কোন কারণে রমাকে একবার সেখানে দেখা যায়, সেই আশাটা বড় চঞ্চল করছিল তাকে তখন। কিন্তু গাড়ীতে ষ্টার্ট নেবার আওয়াজ হলে দীনেন দেখল, দোতালার জানলার পর্দা সরিয়ে বীণা এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ সারা সকালের মধ্যে একবারও যে ওর কথা মনে পড়েনি সে কথাটা ভেবে খানিকটা আশ্চর্য হলো দীনেন। তারপর গাড়ীতে স্পীড নেবার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বীণাকে হাত তুলে বিদায় জানালো।

পার্ক ষ্ট্রীটের বিনয় কাকার ফ্ল্যাটে পৌছুতে দীনেনের বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল। অফিস টাইমে রাস্তায় একটা ঠেলা গাড়ী উল্টে গিয়ে বিবাদ বাধিয়েছিল।

দীনেন এক তলায় স্কুটারটা সাবধানে রেখে লিফটে উঠে পড়লো। বিনয় কাকার ফ্ল্যাটে তেতালায় দেড়খানা ঘরের সাজানো গোছানো

ফ্ল্যাটটা বার কয়েক কাজে এসে দেখে গেছে সে। দরজায় কলিং বেলটা টিপতেই কিছু সময় পর দরজাটা খুলে গেল।

বিনয় কাকাই খুললেন দরজাটা। প্রায় প্রৌঢ় তবু সখ সৌখিনতা ছাড়েননি। বয়সের অনুপাতে ছেলেমানুষ দেখায় তাকে, মজবুত গড়ন, অসম্ভব সুপুরুষ।

দীনেনকে দেখেই বললেন।—তোমার কাকিমা খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে তো, কালকে আমাদের এজেণ্টের এক পার্টি ছিল, সেখানে বেশ রাত হয়ে গেল, আর বাদলাও ছিল, তাই আর ফেরা হয়নি, ফোন করার কথাও মনে ছিল না।

—কাজের ঝামেলায় বীণার ব্যাপারটাও মনে ছিল না জানো। বেশ দ্রুত গলায় কথাগুলো বলেছিলেন। জন্মদিনে দীনেন টের পেল সকালেই তার মুখে বেশ মদের গন্ধ! চোখদুটো লালচে দেখাচ্ছে এখনও।

—তুমি ফোন করে দিও, আজও বোধ হয় আমার যাওয়া হবে না। তবে শনিবার সকালেই ফিরব নিশ্চয়ই। সকালে একবার ট্রাই করলাম এ ফ্ল্যাটের ফোনটা আবার খারাপ হয়ে আছে।

—যত সব ঝামেলা। বলতে বলতে এক সময় থেমে গেলেন তিনি। দু' পলক দীনেনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোন কিছু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করার সময় তার চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে আসে, দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।—বসবে না কি? না আবার তোমার অফিসের তাড়া আছে।

—বড্ড দেরী হয়ে হয়ে গেছে, চলি এখন। হয়ত উল্টে ঘড়িটা দেখে বলল দীনেন। সে বেশ বুঝল আর বেশীক্ষণ তাকে আটকে না রাখলেই বিনয় কাকাবাবু খুশী হবেন। কি একবার উত্তেজনায় তিনি বেশ চঞ্চল হয়ে আছেন। ঘরের ভেতরে মেয়েলী চলাফেরার আওয়াজ দীনেন বাইরে থেকেও বেশ টের পাচ্ছিল।

—যাবে, বেশ তোমার কাকীমাকে একটু বুঝিয়ে বলো। কাজটা

খুব জরুরী। বলতে বলতে তিনি ছটফট করে উঠে বার কয়েক দুহাত ঘসলেন।

দীনেন আর দেরী করল না। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। বিনয় কাকাবাবুর ঐ মিথ্যে কথা বলা, তার না চাপতে পারা উত্তেজনা, ঘরের ভেতর কোনো নিষিদ্ধ মহিলার উপস্থিতি, সব মিলিয়ে দীনেনের মজা লাগছিল ব্যাপারটা বেশ।

মজায় আছেন উনি। ভাগ্যটাও ভালো, টুকিটাকি ব্যবসায় বেশ দু' পয়সা হাতে আসে, জীবনটাকে ইচ্ছামত ভোগ করার মত শক্তি বা সাহস দুটোই আছে তাঁর। আর কি চাই?

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে এক পলক ভাবল দীনেন। বিনয় কাকাবাবু কি সুখী? যথেচ্ছা জীবন ভোগের মধ্যে কি সুখ শান্তি আছে? না ও দুটো কেবল অভিধানের দুটো শব্দ মাত্র। আসলে ওদের কোন বাস্তব অর্থ নেই। অন্তত মানুষের জীবনের বিষয়েও দুটোর কোন প্রয়োগ চলে না? কে জানে?

—তিন—

রবিবার সন্ধ্যেবেলা কাকিমা, রমা আর ডাঃ দাসকে নিয়ে বসেছিলেন।

দীনেন এলো শ্যামলকে নিয়ে। শ্যামলকে দেখে রমা সৌজন্য প্রকাশ করে সোফা থেকে সামান্য উঠে দাঁড়াল, শ্যামল নমস্কার করলে দীনেন লক্ষ্য করল রমা অদ্ভূত ভঙ্গীতে মাথাটা নীচু করে তার তরফ থেকে ভদ্রতা প্রকাশ করল।

খুচরো দু' একটা কথার পর আলাপটা জমে উঠল বেশ। দীনেন চুপ করে বসে লক্ষ্য করছিল, রমা অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী কথাবার্তা বলেছে, ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ এক ধরণের অদ্ভূত হাসি হাসছে। বুকটা তার অকারণেই ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। দীনেন ঘরে বীণাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

কথাবার্তা বিভিন্ন বিষয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, শ্যামল বেশ সহজ ভাবেই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছিল মাঝে মাঝে, তার ঠোঁটেও হাসির ঝিলিক দেখা যাচ্ছিল।

দীনেনের তেমন মন লাগছিল না কিছুতে বরং সে কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

কয়েক পলক ডাঃ দাসকেও লক্ষ্য করল সে। কাকিমার বন্ধু গোষ্ঠীর একজন।

এ বাড়ীতে নিয়মিত হাজিরা দেন ভদ্রলোক, বয়স পঞ্চাশের ধার ঘেঁষে। চেহারায় আরো একটু বেশী বলে মনে হয়।

ছিপ ছিপে গড়ন, গায়ের রঙ ময়লা। মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। মুখটা লম্বা ধরণের, গালের হাড় চোখে পড়ে। নাক একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ, ঠোঁট পুরু।

ভদ্রলোকের বিলেতের কয়েকটা ডিক্রি আছে, মাঝারি গোছের প্র্যাকটিশ। রোজ সন্ধ্যেবেলা নিজের বড় প্রাচীন মডেলের গাড়ীটায় চেপে এ বাড়ীতে আড্ডা দিতে আসেন। ডাঃ দাসের মত আরো হু' চারজন নিয়মিত পুরুষ আড্ডাধারী আছেন কাকিমার। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলা তাদের আড্ডা বসে কাকিমাকে ঘিরে।

দীনেনের মনটা অকারণেই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এর চেয়ে বরং কলকাতায় আড্ডা দিতে গেলে ভালো হত। শ্যামলের ভারী স্বরের গলাটা ঘরের মধ্যে গম গম করছে।

পূর্ববাংলার বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল সে। দীনেন দেখল সুন্দর ভঙ্গিতে গালের পাশে হাত রেখে রমা একাগ্র হয়ে শ্যামলের কথা শুনছে। শ্যামলকে যে কাকিমারও বেশ পছন্দ হয়েছে দীনেন সেটা টের পাচ্ছিল মনে মনে।

একটা সিগারেট খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল তার। চা খাবার পর একবারও ধোঁয়া না টানলে কেমন বিচ্ছিরি লাগে। ওদের আলোচনায় বাধা না দিয়ে দীনেন উঠে ভেতরের বারান্দার দিকে এল। টানা করিডোরটায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ও পাশের ঘরটা বীণার পড়ার ঘর।

দীনেন ভাবল বীণার সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দিলে মন্দ হয় না। সিগারেটটা ধরিয়ে সে বীণার পর্দা ফেলা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর গলায় একটু শব্দ করে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

বীণা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একমনে কোন বন্ধুকে চিঠি লেখায় ব্যস্ত ছিল। দীনেনের পায়ের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। লালচে ধরণের একটা শার্ট আর নীল রঙের জামা তার পরণে।

দীনেনকে চোখে চোখে দেখল বীণা। চোখ নামাল। বলল, —কি ব্যাপার হঠাৎ তুমি এ ঘরে ?

—ওরা ভীষণ আড্ডা জমিয়েছে, আমার ভাল লাগলো না তাই

চলে এলাম। সিগারেটটা খেতে বেশ সুখ পাচ্ছিল বলে দীনেন ঘন ঘন টান দিচ্ছিল।

চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে সরে বসতেই, বীণা তাড়াতাড়ি প্যাডটা বন্ধ করলো। কলমের ঢাকনিটা পড়লো।

—কি, চিঠি লিখছিলে নাকি বন্ধুকে? দীনেন আড়চোখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।

—রুবি আজ কদিন ক্লাশে আসতে পারছে না, তাই পড়াশুনার বিষয় জানিয়ে দিচ্ছিলাম ওকে। মাথাটা নীচু করেই কথা বলছিল বীণা।

—কেন ওর জ্বর না কি? দীনেন অন্য কথা ভাবতে ভাবতে আনমনার মত বলল।

—না না জ্বর কেন হবে, ওর মাসির বিয়ের ব্যাপার চলছে বাড়ীতে, তাই।

—তাহলে বলো তোমার বন্ধু বেশ আনন্দেই আছে।···তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি বিয়েতে?

-বিয়েটা তো ওদের বাড়ীতে হচ্ছে না, মামাবাড়ির ব্যাপার, আমাকে নেমতন্ন করবে কি করে?

—তা তো বটে। দীনেন মজার ধরণের মাথা নাড়িয়ে বলল। তার মনটা তখনও ওঘরের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল বলে বীণার সঙ্গে জমিয়ে কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল তার ভেতরে ভেতরে।

দীনেনকে চুপ করে থাকতে দেখে এবার বীণা বলল,—জানো দীনেন-দা, একটু আগেই মনে হচ্ছিল আমার, আজ একবার এঘরে তুমি আসতে পারো? সহজ গলাতেই কথাটা বলল ও।

—কি করে মনে হল আমি আসব? দীনেন সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে হাসিমুখে বলল ইনটুইশান নাকি?

—অনেকটা তাই। কথার সঙ্গে হাসল বীণা। যদিও তোমাকে দিয়ে আমার একটা কাজ করিয়ে নেবার ছিল।

—আমাকে দিয়ে আবার তোমার কি কাজ হবে ?

—তেমন কঠিন কিছু নয়, গোটা চারেক রুমালে তুমি নূতন ধরণের কোন নক্সা এঁকে দেবে। বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বীণা, তারপর চটি ফট্ ফট্ করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থামল একটু। আমি এখুনি আসছি, তুমি কিন্তু পালাবে না যেন আবার।

পাশের ঘরে মিলিত গলার দমকা হাসিটা শোনা গেল তখন। দীনেন কান পেতে ছিল, কাকিমা আর রমার সরু গলার পাশে পাশে শ্যামলের ভারী সুরেলা গলা ও ডাঃ দাসের গলাটা মিশে কেমন অদ্ভুত শোনালো।

ফাঁকা ঘরে বসে থাকতে থাকতে দীনেন দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলল অকারণে। টেবিল থেকে বীণার একটা বই টেনে নিয়ে মন বসাতে চাইল।

ইউরোপের ইতিহাস, দূর—দূর ! বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল সে। থেকে থেকে আজকাল মনটা বড় উদাস হয়ে যায়। বড় রকমের কিছু একটা মুঠোয় ধরবার নেই বলেই এমন হচ্ছে।

দীনেন অনুভব করতে পারল। কি দিয়ে যে মনের এই ফাঁকা অবস্থাটা ভরবে তারও কোন হদিশ জানা নেই তার।

অথচ একাকী স্ফূর্তিবাজ দায়-দায়িত্বহীন জীবন, মাঝারী মাইনের একটা চাকরী, সুন্দর নিরেট স্বাস্থ্য, চেষ্টা চরিত্র করলে একজন মোটামুটি প্রেমিকাও জুটতে পারে তার যখন, তখন তবু কেন এই বই চেপে ধরা শূন্যতা ?

দীনেন ভাবল এভাবে জীবন চলে না, একটা কিছু অন্য ধরণের কাজে মন বসাতে হবে, তা নইলে এই হঠাৎ হঠাৎ মনের হু হু করে ওঠাটা যাবে না।

আর্ট ইস্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরী নেবার পর প্রথম প্রথম মনটা

ভীষণ খারাপ লাগত। কত ইচ্ছে ছিল একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট হবে, তা না, শেষ পর্যন্ত তেল সাবানের বিজ্ঞাপন আঁকিয়ে।

তবু একদিক থেকে ভেবে দেখলে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে ভালোই হয়েছে তার পক্ষে। বাবার জমানো টাকাটাতো শেষ দিকে ফুরিয়ে অমনিতে এসে ঠেকেছিল, আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েই চাকরী না পেলে বেশ মুস্কিলে পড়তে হতো তাকে।

ঐ টাকা পয়সা হাতে না থাকার কষ্টটা একদমই সহ্য হয় না তার। একজন ফাইন আর্টিষ্ট হলে কপালে খুব দুঃখ ছিল দীনেনের।

চাকরী বাকরী পাওয়া যেত না হট করে, আর যদি বা সুযোগ হত তাহলেও তো সেই কোন ইস্কুলের ড্রইং মাষ্টার।

তাতে ঠিক মন বসাতে পারত না দীনেন। বাবার জমানো টাকায় যে ভাবে সাহেবী ইস্কুলের কলেজের হোষ্টেলে মানুষ হয়েছে, নিজের রোজগারের পয়সাও তেমন ভাবে চালাতে পারছে, সেদিক থেকেও একটা তৃপ্তি আছে।

খুব একটা ঠকে যেতে হয়নি জীবনে, বরং দু'হাতে নিজের রোজ-গারের পয়সা খরচ করেও প্রতিমাসে কিছু কিছু করে জমে যাচ্ছে। ব্যাংকে।

ব্যাপারটা মন্দ নয়। আর এ ধরণের চাকরীতে আজকাল অনেক রকম সুখ সুবিধা আছে। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসাবে একটু নাম হলেই অন্য পাঁচটা কোম্পানী মোটা টাকার টোপ ফেলবে। চাইলে পরে দিল্লী বোম্বাই যে কোন জায়গায় চাকরী পাওয়া সহজ। আজকাল দীনেনও টের পাচ্ছে ব্যাপারটা। বোম্বের দুটো কোম্পানী সেই কবে থেকে উঁচু মাইনের অফার দিয়ে রেখেছে তাকে, যে কোন দিন ওদের ওখানে জয়েন করলেই হয়।

এসব সত্ত্বেও বুকের মধ্যে এত শূন্যতা কেন? এবারে অন্য ধরণের কিছু একটা কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে, দীনেন মনে মনে ঠিক করে ফেলল।

এবারে শীতের শেষ দিকে একটা একজিবিশান করে ফেলবেই সে। নিজের খেয়াল খুশিমত গোটা চারেক কাজ শেষ হয়ে পড়ে আছে কবে থেকে, এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কিছু পেন্টিংয়ের আইডিয়া অনেকদিন হল মাথার ভেতর ঘুরছে। এবার সেগুলো নিয়ে বসতে হবে। মনের সংকল্পটা মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেই সমর্থন জানাচ্ছিল দীনেন আপন মনে।

বীণা ঘরে ঢুকে তার ওই অদ্ভুত মাথা নাড়ানোটা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল, তুমি কি পাগল হলে নাকি দীনেনদা, একা ঘরে বসে মাথা নাড়াচ্ছো।

দীনেন একটু অপ্রস্তুত হল, তবু বীণার ওই হাসিটার মনের ক্ষুব্ধ কাতর ভাবটা খানিক কেটে গেল তার। এখনও না হলে শিগগীর শুয়ে যাবো মনে হচ্ছে। তাই আগে থাকতে প্র্যাক্‌টিস করছিলাম। ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে শেষ দিকে নিজেই হেসে ফেললো সে।

ওমা প্র্যাক্‌টিস করে পাগল হওয়া যায় নাকি? তাতো জানতাম না। কৌতুকে বীণার গলার স্বরটা এবার ফাঁকা হল।

এই সময় ঘরে চা নিয়ে এল শ্যাম। চা আর চিঁড়ের সঙ্গে কুচো নারকেল ও বাদাম ভাজা মেশান। দিব্যি খুশী হয়ে লাফিয়ে উঠলো চেয়ারে। অনেকক্ষণ থেকেই আবার তার চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল। —বেঁচে থাকো বাবা শ্যাম। কতক্ষণ থেকে যে প্রাণটা চা-চা করছিল। তার উপরে চিঁড়ে ভাজা আবার। আজ দেখি লাকটা খুব ভালো যাচ্ছে আমার।

দীনেনের উৎসাহের ছোঁয়ায় শ্যামও লাজুক ভাবে হেসে ফেলল। তারপর শ্যাম চলে গেল বীণাই চা ঢেলে দীনেনের দিকে এগিয়ে দিল, চিঁড়ে ভাজার প্লেটটা রাখল।

দীনেন সব দেখে ভ্রু-নাচিয়ে বলল,—দেখলে একেই বলে ইচ্ছে

শক্তি। ঠিক যা যা চাইছিলাম এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর একমুঠো চিঁড়ে ভাজা মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। বা! ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়েছে। তোমরা আমাকে পেটুক বা লোভী যাই বল আমি একশোবার বলব, পছন্দমত খাবারের চেয়ে পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

—ভোজন রসিকেরা চিরকালই ও কথা বলে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বীণা বলল। তার গলার স্বরে চোখের মণিতে হাসির ভাবটা ঝিলক দিচ্ছিল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে দীনেন আস্তে আস্তে চা আর চিঁড়ে ভাজাটা খেল। সে সময় অন্য কোন খেয়াল ছিল না তার। মনের বিষাদের ভাবটার সঙ্গে ক্ষুধার ভাবটাও মিশে ছিল বলে দীনেন এতক্ষণে একাগ্র হয়েছিল।

এবার মুখটা মুছে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল বীণা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বীণার চোখে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল সে! ওর ঐ সহজ দৃষ্টিটায় কেমন অস্বস্তি লাগল তার। কই তোমার রুমাল টুমালগুলো দাও এবার। বলতে বলতে ব্যস্তভাবে হুস্ হুস্ করে সিগারেট টানতে থাকলো।

বীণা হঠাৎ বলল।—ও ঘরের আড্ডটা তো এখনও ভাঙ্গেনি, তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? তারপর ফিনফিনে কাগজে মোড়া রুমালের প্যাকেটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

দীনেন প্যাকেটটা এক পলক দেখল। ঘি রঙের রুমাল। কোন ছেলে বন্ধুকে কিন্তু আবার রুমাল উপহার দিয়ে বসো না। নিজের অস্বস্তিটাকে হাল্কা করে দিতে গিয়ে বলল দীনেন।

—কেন ছেলে বন্ধুদের রুমাল উপহার দিলে কি হয়?

একেবারে চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

—দূর যত বাজে কথা তোমার তাই কখনও হয় নাকি? লাজুক লালচে মুখে ছোট করে হাসল বীণা।

—বেশ আমার কথা না মেনে কাউকে উপহার দিয়েই দেখনা। একেবারে চিরকালের মত যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে তখন বুঝবে। দীনেন কথার সঙ্গে হাসছিল।

—ওসব সুপারটিশান নেই আমার। মুখটা গম্ভীর করে বীণা বলল।

—বেশ তো একবার পরীক্ষা করেই দেখ না। দীনেন চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল এবার। একবার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দেবার সময়।

বাইরে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার, গেটের ওপাশে রাস্তার আলোর তলায় দুটো কুকুর শুয়ে আছে। দীনেন ঘর ছেড়ে বারান্দায় নামল, তারপর ওঘরে গেল। আড্ডার সুরটা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছিল, দীনেনকে ঘরে ঢুকতে দেখে শ্যামল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—উঠি আজ।

শ্যামলের সঙ্গে সঙ্গে রমাও উঠে পড়ল।

কাকীমা বললেন,—তাহলে কথা রইল আমাদের পিকনিকে যাবার আগে তুমি একবার আসছো শ্যামল।

—কথা যখন দিয়েছি, আসতেই হবে তখন। শ্যামল হাসল রমার চোখে চোখ রেখে।

দীনেন লক্ষ্য করল তার তাকানোটা। শ্যামলদের সঙ্গে রমাও এল দরজা পর্যন্ত।

দীনেন এগিয়ে গিয়েছিল খানিক। রমার গলার আওয়াজে পেছন ফিরে তাকাল। দরজার পাল্লাটা ধরে রমা দাঁড়িয়ে, শ্যামল বারান্দায়।

দুজনে মুখোমুখি। দীনেন শুনল রমা বলছে—এবারে আসবার সময় কিন্তু হাতে ঘড়ি বেঁধে আসবেন না। জমাট আড্ডার মাঝখান থেকে কেউ উঠে গেলে, আমার ভীষণ বিচ্ছিরি লাগে!

—বেশ পরীক্ষা করা যাবে না হয় একদিন। সরল সরল গলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল শ্যামল।

এরপর গেটের বাইরে এসে শ্যামল বলল।

—কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে, বুঝে উঠতে পারছি না। যা একখানা দারুণ প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন আপনি, রহিমটা থাকলে আজ আপনাকে নির্ঘাৎ কাঁধে তুলে ঘুরপাক খেতো কয়েক পাক। না হলে থাপ্পড় মেরে মেরে আপনার পিঠটা জখম করে ছাড়তো একেবারে।

আন্তরিক ভাবে কথা বলছিল শ্যামল, ভীষণ পাগলাটে ছিল তো, ওব ভাল লাগার প্রকাশগুলো ছিল ঐ রকম মারাত্মক ধাঁচের। লোকেরা ঠিক লক্ষ্য করতে পারত না সব সময়। কথার শেষে বিষণ্ণ এক ধরণের হাসি ফুটলো ঠোঁটে।

দীনেন চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ভেবে পাচ্ছিল না এ সময় কি বলা উচিত তার? কথা বলার সময় শ্যামল নরম করে দীনেনের দেওয়া খামটার উপর হাত বোলাচ্ছিল। যেন বন্ধুর খামটার উপর আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তার খ্যাপাটে পাগলামির খানিকটা স্পর্শ পেতে চাইছিল।

এরপর শ্যামল আর দাঁড়াল না, মেসের দিকে পা বাড়াল।

দীনেন অনেকক্ষণ চুপচাপ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তার যাওয়াটা লক্ষ্য করল। লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা পার হচ্ছে শ্যামল। মিহি জ্যোৎস্নায় তার লম্বা চলন্ত শরীরটা দূর থেকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

শ্যামল কি ধরণের মানুষ? পলাতক, শিক্ষিত মহান আদর্শবাদী একজন, না কি কোন সুযোগ সন্ধানী চতুর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্র?

বিমলের কাছে থেকে ভালো করে খোঁজ খবর নিতে হবে একবার। ভাবল দীনেন এক পলক। তারপর সন্ধ্যেবেলায় রমার আচরণটা মনে পড়ল। বুকের ভেতরে একটা কাঁটার খোঁচা অনুভব করতে পারল যেন সে।

অন্য দিনের আচার আচরণের সঙ্গে আজকের হঠাৎ উচ্ছলতার কোন মিল নাই। সাধারণত রমাকে কেমন ঠাণ্ডা শান্ত ধরণের বলে মনে হয় দীনেনের।

সচরাচর দু'চারটে কথার বেশী বলে না কখনও। প্রাইভেট বি, এ, পাশ করে বাড়ীতে বসে আছে।

বিনয়কাকাবাবুর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তেমন লক্ষ্য নেই। কাকিমার মনের আসল উদ্দেশ্যটা সহজে বোঝবার উপায় নেই।

ভীষণ চাপা ধরণের মানুষ উনি, যতটুকু বুঝেছে তাকে তাতে মনে হয়েছে দীনেনের। তবে এটা ঠিক, বড় মেয়েকে মনে প্রাণে ভালবাসেন কর্তা-গিন্নী দুজনে। বীণার আদর কেবল বাবার কাছেই।

ভাল করে মনে পড়ল না দীনেনের এ বাড়ীর কার মুখে যেন শুনেছিল দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসবের সময় কাকিমা ভীষণ আশা করেছিলেন দ্বিতীয়টি তার পুত্র সন্তান হবে।

সেদিক থেকে নিরাশ হয়ে বীণার উপর থেকে ভালবাসা চলে গিয়েছিল তার। আর মায়ের ভালবাসার অভাবটা কি করে যেন টের পেয়েছিল বীণা। এ নিয়ে তার মনে একটা দুঃখবোধও আছে।

প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলো দীনেন। বীণাকে সে তাই তেমন করে কাকিমার আশে পাশে ঘুরতে দেখে না দীনেন।

অন্যদের বিষয় ভাবনা শেষ করে, দীনেন গেটটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে ফিরল। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের শব্দ গুলো কেমন আস্তে আস্তে জুড়িয়ে আসছে।

একেই যা নির্জন এই এলাকাটা, সন্ধ্যে থেকে চুপচাপ হয়ে যায় সব, দু'একটা মোটর বা লরির ছুটন্ত শব্দ ছাড়া তখন খুচরো কিছু প্রাকৃতিক শব্দ শুধু থাকে। চার পাশের নিস্তব্ধতার ভেতর দীনেন ফাঁকা শূন্য মনটায় আরো বেশী করে ডুবে যাচ্ছিল। জীবনে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যবস্তুর অভাবটাই তাকে বেশী করে পীড়ন করছিল তখন।

পথ মাইল তিনেকের কিছু বেশী। কাল রাত্তির থেকেই মুখার্জি

বাবু তাকে স্ত্রী দুই বাচ্চা আর বিমলা নন্দী এসে এ বাড়ীতেই রাত কাটিয়েছেন। ডাঃ দাস, সোনামণি বাবু বা তার পেট্রোন মিসেস বসু আসবেন ভোরবেলায় সময় মত।

এরা সবাই কাকিমার বন্ধু বান্ধবীর দল, বিনয় কাকাবাবুকে দল থেকে বাদ দিতে হল, একটা জরুরী কাজের তাড়ায় দিল্লী যাচ্ছেন তিনি।

শ্যামল কথা দিয়েছিল, কাকা ভোরে উঠেই চলে আসবে। এ বাড়ীতে দীনেন, কাকিমা, রমা বা বীণা ছাড়াও মানব আর রুমী ছিল।

শেষ পর্যন্ত দলের লোকসংখ্যা প্রায় ষোল সতের জনে দাঁড়াল। সোনামণি বাবু আফিস থেকে ড্রাইভার সমেত ঝকঝকে বাসটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গত কালই, ডাঃ দাসের গাড়ীটাও সঙ্গে যাচ্ছে।

জমজমাট ব্যবস্থা হল পিকনিকের। ডাঃ দাস আর সোনামণি বাবু প্রত্যেকের উপরে নির্দিষ্ট কাজের ভার দিয়ে রেখেছিলেন।

দীনেন গত রাত্রে ঘুমোনোর আগে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঠিক সময় ঘুমটা না ভাঙলে লজ্জায় পড়তে হবে। এমনিতে যা বেলায় ঘুম ভাঙে তার।

ভেতরে ভেতরে উদ্বেগটা তো ছিলই, তার উপব এলার্মটাও বাজল ঠিক সময়। যদিও কিছু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দীনেনের। ঘুমের মাঝখানে মনে হয়েছিল কেউ যেন তাকে নাম ধরে ডাকছে। আসলে কি শুনেছে অথবা ঘুমের ঘোরে ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দই শুনেছে কিনা বুঝল না।

দীনেন বালিশ থেকে সামান্য মাথা তুলে শোনবার চেষ্টা করল আর একবার। কিন্তু অনেকক্ষণ সে তেমন কোন সাড়া শব্দ পেল না।

একবার মনে হল, হয়ত সত্যি সত্যি অন্য কেউ ডাকেনি, স্বপ্নের মধ্যে রমার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটাকেই ভ্রমবশতঃ কারো গলার ডাক বলে ভুল করেছে।

দীনেন বালিশে মুখ ডুবিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ফেললো। অন্যদিনের

মত আর বিছানায় গড়ালো না সে। উঠে পড়ল দ্রুতগতিতে, ঘরের আলোটা জ্বেলে তাক থেকে পেষ্ট আর ব্রাশটা নিয়ে বাথরুমে গেল। বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলো কাক ডেকে উঠল হঠাৎ, চিড়িক চিড়িক কয়েকটা পাখির ডাকও শোনা গেল। অন্যদিন নিত্যকর্ম সারতে বেশ একটা সময় লাগে, আজ কিন্তু সেগুলোও তাড়াতাড়ি সারা হল।

দীনেন ঘরে এসে জানালা খুলে বাইরেটা দেখল। অন্ধকারটা ঝাপসা ঝাপসা হয়ে এসেছে, ভিন্ন ধরণের একটা হাওয়া দিচ্ছে।

জলে ভেজা মুখটা সেই হাওয়ার দিকে বাড়িয়ে সে জড়তাটা কাটাতে চাইল। সেদিন রাত্রে ট্যাক্সিতে বমি করবার পর থেকেই আশ্চর্য্যভাবে ভেতরটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে দীনেনের। মিথ্যে দিনকয়েক ঐ ভূতগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে নিরাময় হয়েছে, তার এমন বোধ থেকেই মনটা দিনকয়েক একটু বেশ প্রফুল্ল থাকছিল। জীবনের গম্ভীর ভারী ব্যাপারগুলো একটু বেশ ভাবলেই ঐ রকম হয়।

দীনেন মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিল যতটা পারে প্রফুল্ল মনে, নির্ভাবনায় কাটাবে সামনের দিনগুলো। পূজোর ছুটিটায় খুব ঘুরে বেড়াবে এদিক ওদিক, চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবে। একজিবিশনটা না হয় পিছিয়ে দিবে কিছুদিন। রঙ তুলি হাতে নিয়ে নিজের মনোমত কাজ করতে বসলেই আবার জীবনের গভীর ভারী বিষয়গুলো চেপে বসতে পারে মনের উপর।

ও বাড়ীর ঘরে যেন আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে দেখে, দীনেন জানালা থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি পোষাকটা বদলে নিল।

পা চাপা কালো প্যাণ্ট আর কলার দেওয়া লাল রঙের সৌখিন গেঞ্জিটায় মন্দ দেখাচ্ছিল না। বাতাসে একটু শীত শীত ভাব ছিল বলে, হাতকাটা সোয়েটারটাও চাপিয়ে নিল তার উপর।

আয়নায় ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল একবার। তারপর টেবিলের

উপর থেকে কালরাত্রেই গুছিয়ে রাখা টুকিটাকী জিনিষগুলো ভরে নিল প্যান্টের তু'পকেটে, ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বাজে। আর সামান্য পরেই সকাল হবে। দীনেন পায়ে কাপড়ের রঙদার জুতোটা পরে ঘরের বাইরে এসে দরজায় তালা লাগালো।

বারান্দায় উঁচু হয়ে বসে শব্দ করে মুখ ধুচ্ছে রামসিং। দীনেন তার দিকে একবার তাকিয়ে বাগানের রাস্তায় পা বাড়াল। জলো অন্ধকারও ফিকে ফরসা হয়ে এসেছে। পাতলা ধোঁয়ার মতন কুয়াশা গায়ে গা মিশিয়ে আছে যেন।

গাছের শাখায় পাখিগুলো ভোর হয়ে আসার কলরব করছিল, কাকগুলো দল বেঁধে ডাকতে শুরু করেছে।

বারান্দায় পা দিয়েই দীনেন দেখল, বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, অনেক মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে, চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দও হচ্ছে। দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ভেতরের সকলে কলরব করে উঠল।

ঘুম ভাঙ্গতে এত দেরী তোমার ?

দীনেন ওদের কথায় হাসল তারপর সোফায় বসতে বসতে বলল—সব ব্যবস্থা তো হয়েছে ঠিকমত, আপনার লিষ্টটা একবার বের করুন ডাক্তারবাবু, মিলিয়ে নেওয়া যাক।

—থাক, তোমাকে আর সে দিকটা ভাবতে হবে না।

বিমলা নন্দী মুখ ঝাপটা দিলেন। ভেতরের দিকে দীনেন সোনামণি বাবুর গলার আওয়াজ পাচ্ছিল বেশী করে। ওর চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘরের কেউ তেমন কর্ণপাত করছেন বলে মনে হল না দীনেনের।

রমা দীনেনের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিল। তারপর মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল—কই তোমার বন্ধুর দেখা নেই এখনো ? ভদ্রলোক পিকনিকের কথাটা ভুলে যাননি তো ?

—মনে তো হয় না। তুমি তো রাম সিংকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলে ওর মেসে শুনলাম। দীনেন কিছুটা রঙ্গের সুরে বলল। এক পলকে

দেখল রমার মুখ ও গালে কেমন একটু লালচে আভা লেগেছে বলে বোধ হল যেন তার।

রমা তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঘরের অন্য দিকে চলে গেল।

মিসেস বসু এসে পড়লেন এই সময়। অল্প বয়সের বিধবা কিন্তু বেশ কিছুকাল ইউরোপে ছিলেন বলে, চাল চলনে একটা মার্জিত সৌখিন আধুনিকতার ছাপ আছে, চেহারাটাও মন্দ নয়। দীনেন দেখছিল ঘি রঙের সাড়ি ব্লাউজে সুন্দর লাগছিল ভদ্রমহিলাকে।

ঘরে কিন্তু বীণা বা তার বন্ধু রুমি ওরফে রসনার দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। দীনেন দেখল মানব কি একটা কাগজ পড়ছে মন দিয়ে। বাচ্চা দুটো মুখার্জীবাবুর স্ত্রীর কোলের কাছে চুপ করে শান্ত হয়ে বসে।

ওদের দেখে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল দীনেনের, বাচ্চারা শান্ত হয়ে থাকলে কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয় তার।

মুখার্জি মশাই দু'চোখ বুজে টোষ্ট চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাঃ দাস একমনে পাইপে ধোঁয়া ছাড়ছেন। সোনামণিবাবু গট গট করে ঘরে এলেন। গোলগাল চেহারা, গায়ের রং ফর্সা। মাথার চুল বেশীর ভাগই পাকা। তবু মাঝখানে সিঁথি করে দু'পাশে বাবু করে চুল আঁচড়ানো। সখের গোঁফটা সযত্নে বিন্যাস করা।

দীনেনের সোনমণিবাবুকে বেশ ভালো লাগে। হাসি-খুশি স্বভাবের, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

—এখনও চা খাচ্ছেন আপনারা! তারপর তৈরী হতে হতে যে দুপুর কাবার হয়ে যাবে। বিশেষতঃ ঘরের উপস্থিত ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশ্য করেই বললেন কথাগুলো, আবার কাজের তাড়ায় অন্য দিকে ছুটে গেলেন।

মিসেস বসু তার যাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে উষ্ণ গলায় বললেন —সোনাবাবুর সব তাতেই তাড়াহুড়ো।

দীনেন দেখল বিমলা নন্দী আর কাকিমার মধ্যে কেমন এক ধরণের চোখাচোখি হল। দুজনে চাপা ঠোঁটে হাসলেন তারা। বাইরের বারান্দায় এবার শ্যামলের গলা পাওয়া গেল। কাকে যেন লক্ষ্য করে উঁচু গলায় বলল—কত্তা, এখানেই রাখেন, আমি মা ঠাকরুণদের ডাইক্‌কা আনি।

সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো শ্যামল। স্নান সেরে ধুতি পাঞ্জাবীতে সেজে এসেছে ঢুকেই বলল—সবাই এক একটা করে কাঁচের গেলাস নিয়ে আস্থন তাড়াতাড়ি। বেশ প্রসন্ন স্বরে কথা বলল শ্যামল। কি ব্যাপার কি? পাইপ নামিয়ে ভ্রূ নাচালেন ডাঃ দাস।

—টাটকা খেজুরের রস পেয়ে গেলাম, এক্কেবারে স্বদেশী জিনিষ, দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি গেলাস নিয়ে আস্থন। বলেই আবার সে বাইরের বারান্দায় গেল।

ঘুম ভাঙার পর থেকেই আজ সকলের প্রাণে একটা ছেলেমানুষী হাওয়া বইছিল বলে, শ্যামলের ডাকে বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেল। সবাই তাড়াতাড়ি করে গেলাস হাতে বাইরের বারান্দার এসে ভীড় করে দাঁড়াল। বুড়ো মতন লোকটা মাটির হাঁড়ি থেকে রস ঢেলে গেলাস ভর্তি করে দিতে লাগল।

—ফার্স্ট ক্লাস।

—সত্যি অপূর্ব।

—না শ্যামল, তোমার নির্বাচনটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে। বিভিন্ন মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুস্বাদু রস খাচ্ছিল। বীণা, রমলাও কখন ভীড়ের মধ্যে এসে যোগ দিয়েছে দীনেন লক্ষ্য করেনি। তার চোখ ছিল রমার দিকে। চোরা চাউনি দিয়ে রমা বারবার শ্যামলের দিকে তাকাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে সূর্য পুরোপুরি উঠে গেল; কুসুম রঙের রোদ ছড়িয়ে পড়ল। সাজগোছের ব্যস্ততায় ঘরে ঘরে মহিলাদের গলা

ঝন ঝন করে উঠল। দীনেন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। শ্যামল মুখার্জিবাবুর রাজনীতির আলোচনায় মেতেছে।

ঐ আলোচনায় তেমন উৎসাহ ছিল না বলে নিরিবিলিতে চলে এসেছে বাইরে। শ্যাম ঠাকুর আর ড্রাইভার মিলে বাড়ীর ভেতর থেকে জিনিষপত্রগুলো এক এক করে বাসের ভেতর এনে রাখছিল, ডাঃ দাস পাইপ টানতে টানতে পায়চারি করছিলেন বাগানে। সোনামণি বাবু চাকর-বাকরদের কাজকর্ম তদারকী করছেন। দীনেন রাস্তা দিয়ে দুধের গাড়ী, খবরের কাগজের ফিরিওয়ালাদের সাইকেলে ছুটে যাওয়া লক্ষ্য করছিল, এই সময় বীণারা এলো গেটের কাছে।

বীণাকে অন্য রকম দেখাছিল। হলুদ ফুল আঁকা শাড়ির সঙ্গে লাল গরম ব্লাউজ আর উঁচু করে বাঁধা খোঁপা নূতন রকম লাগছিল। রসনার গড়নটা একটু বেঁটে-খাটো, নাকমুখের ছাঁদ একটু ভারী ভারী। টাইট সালোয়ার, কামিজ আর ছাঁটাচুলে তার বেঁটে খাটো খোঁচাওয়ালা শরীরটাই যেন অদ্ভুত ধরণের মনে হচ্ছিল দীনেনের। টাইট পোষাকে শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলো ফেটে পড়ছিল যেন।

—বিয়ের নেমতন্নটা কেমন খাওয়া হলো। বীণা আলাপ করিয়ে দিতে দীনেন বলল।

রসনা কিছু না বলে নীরবে হাসল। ওর দুটো চোখ কেমন করে যেন দীনেনকে দেখছিল।

—এদিকে তো তোমার বন্ধু নেমতন্ন না পেয়ে রেগে কাঁই।

—ওমা তাই নাকি? এবার রসনা কথা বলল। সরু গলার স্বর, বাংলা শব্দগুলোর কেমন বিদেশী ঘেঁষা উচ্চারণ।

—যা!···নারে রুমি, দীনেনের কথা বিশ্বাস করিস না, ওই সব বানিয়ে বলছে। বীণা একটু লাল হয়ে উত্তেজিত গলায় বলল।

ওকে রাগাতে পেরে দীনেন একটু হেসে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে রসনাও।

বীণা অন্যদিকে তাকিয়ে রইল আর ঠিক সেই সময়েই জোরে জোরে

হর্ণ বেজে উঠল মোটরের! দীনেনেরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সোনামণি বাবু নিজেই বাসের হর্ণটা টিপে যাচ্ছেন।

—চল, আর দেরী নয় সোনামণিবাবু যা রাগী দেরী হলে হয়ত আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবেন শেষে। বলতে বলতে দীনেন দ্রুত পা বাড়াল বাসের দিকে। বীণারা হাসতে হাসতে তার সঙ্গে এলো।

সোনামণি বাবুর তাড়াহুড়োয় ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় যাত্রা শুরু হল। পুরো দলটা ভাগাভাগি করে দুটো গাড়ীতে চাপল। ডাঃ দাসের গাড়ীটায় কাকিমা, বিমলা নন্দী, মুখার্জী বাবুর পরিবার সমেত সাতজন হল। অন্য সবাইয়ের সঙ্গে শ্যাম আর রামসিংও চলল। রীতিমত একটা সোরগোল তুলেই শুরু হল যাত্রাটা। সোনামণি বাবু ড্রাইভারের পাশের সিটটা দখল করলেন। ভেতরের বেঞ্চি পাতা আসনে বসল অন্য সবাই। বাসন-কোশন আর অন্য জিনিষগুলো গাড়ির মেঝেতে টাল করে রাখা হয়েছিল। একধারের সিট মেয়েদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। রূপোর ভারী পানের বাটাটা কোলের উপর নিয়ে প্রথম বসলেন মিসেস বসু, তারপর রমা, রসনা, বীণা। অন্য বেঞ্চটায় শ্যামল, মানব, দীনেনরা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল।

বাড়ীর গেট পেরিয়ে গাড়ী রাস্তায় নামতেই হু হু করে বাতাস এল খোলা জানালা দিয়ে।

পথটা নূতন, এর আগে দীনেনরা আসেনি, অন্যদের কাছে তো কলকাতা শহরটা তেমন চেনা নয়। ছড়ানো কালো ফিতের মতো পথটা খুলে যাচ্ছে গাড়ীর চাকার তলায়।

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ চলে আসা গেল। মিসেস বোস চাপা স্বরে রমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, বীণা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, রসনা হাসি হাসি মুখে মানবের দিকে তাকিয়েছিল। ভেতরে মোটামুটি চুপচাপ ছিল সকলে, হঠাৎ শ্যামল প্রস্তাব করে বসল।—একি সব এত চুপচাপ কেন, একটা পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে তা একটু হৈ চৈ নেই, গলা খুলে গান গাওয়া নেই।

—ঠিক, ঠিক বলেছেন আপনি। আমরা কি শ্মশানযাত্রায় যাচ্ছি নাকি? পিকনিক বলে কথা। সোনামণি বাবু পথের দিকেই চোখ রেখে ঘাড় না ফিরিয়েই বললেন।

—তা গানের যদি আপনার এত সখ, নিজেই একটা শুরু করুন না। রমা হাসল শব্দ করে।

—আমি তো গাইতেই পারি, মেয়েদের একটা সুযোগ দিচ্ছিলাম। ঠাট্টা করে বলল শ্যামল।

—জানেন তো মেয়েরা আবার তেমন রসিকের আসর ছাড়া গায় না। আগে আমাদের বুঝতে দিন আপনারা কোন ধরণের রসিক, তবে তো আমরা গাইব।

রমা আবার টিপ্পুণী কাটল।

—বাঃ! একটি জবাবের মত জবাব দিয়েছিস রমা। মিসেস বোস গলা খুলে হেসে উঠলেন।

—ভায়া শ্যাম, এবার পুরুষদের মুখরক্ষা করতে পথ বাতলাও, নইলে যে একেবারে লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না সমাজে।

—তা আপনি শুরু করে দিন না একটা। দেখেও তো আপনাকে সুরসিকই মনে হয়। দীনেন বলল হাসি মুখে।

—আরে ভায়া, তেমন গুণ থাকলে কি আর ছেড়ে দিতুম এমন সুযোগ? এমন রসিকদের আসর কি আর আকছার মেলে। সোনামণি বাবু এবারে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বললেন, তার ফর্সা মুখটা চাপা খুশীর আভায় জ্বলজ্বলে, আমার ঝুলিতে তো সেই সাবেকী কালোয়াতি বা ক্লাসিক্যাল, তাতে কি আর এমন আধুনিকাদের মন ভরবে। কথা শেষ করেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

ততক্ষণে বাসের ভেতর বেশ একটা হাসি খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকলের চোখ মুখেই হাসির ছোঁয়াচ। দীনেন দেখল শ্যামল মুখটা নীচু করে কি যেন ভাবছে। সকলের দৃষ্টি তার উপর।

মানব একটা কনুই দিয়ে ঠেলা দিল তাকে, শ্যামলদা চুপ করে

গেলেন একেবারে। ছাড়ুন কিছু একটা। আজ এমন দুর্ভাগ্য, আমিও আসবার সময় মনে করে গিটারটা নিয়ে এলাম না। সঙ্গে থাকলে এক হাত বাজিয়ে শোনান যেত।

মানবের কথাটা শেষ হবার আগেই শ্যামল তার নোয়ান মুখটা তুলল। তারপর সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই মাথা ঝাঁকাল একবার, তারপর বলল—বেশ তাহ'লে আমিই না হয় শহীদ হলাম প্রথম। বলেই এক মুহূর্ত চুপ করল সে, তারপর তার গলাটা আরো একটু গমগমে হলো, স্বরনালীতে দানা বাঁধা সুরটা ছাড়া পেল। শ্যামল শুরু করল, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। আমরা চঞ্চল—আমরা অদ্ভুত। আমরা বেড়া ভাঙ্গি···

শ্যামলের গমগমে গলার সুরটা ফুলে ফুলে উঠছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল। বহুবার শোনা তবু শ্যামলের গলায় সুর এবং গানের কথাগুলো নূতন শোনাচ্ছিল। ওর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে যে উদ্দীপ্ত ভঙ্গীটা আছে। সেটাই গানের সুরের সঙ্গে মিশে আরো বেশী করে মনোহারী হয়ে উঠেছিল, দীনেন দেখল রমা হাঁটুর উপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে আছে। অন্য সকলের অবস্থাও মোটামুটি এক ধরণের।

গান শেষ হলে সকলেই একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শ্যামল স্মিত হেসে মাথা নোয়াল। সোনামণি বাবু এবার বললেন—আমাদের ক্ষমতা তো দেখিয়ে দিলাম, এবার সুরসিকরা শুরু করুন।

কথাটা তিনি এমন ভঙ্গীতে বললেন যে সকলে হেসে উঠল। ততক্ষণে পথটাও ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাগান বাড়ীর প্রাচীন সেকেলে গেটটার ভেতর বাসটা ঢুকল। দীনেন জানলা দিয়ে এক পলক তাকিয়ে নিয়েই আপন মনে বলল—বাঃ! বেশ জায়গাটা তো।

তারপর বাসটা থেমে যেতেই সকলে তাড়াহুড়ো করে নেমে যে যেদিকে পারল ছুটল। ঝোপঝাড়, বন উপবন, কুঞ্জ থেকে শুরু করে ভেতর দিকে একটা এদো পুকুরও আছে। একতলা বাংলো

প্যাটার্ণের বাড়ীটা প্রায় একটা ধ্বংসস্তূপের মতো। জানালা দরজার কপাটগুলোর জীর্ণ অবস্থা বারান্দার লোহার রেলিংগুলোও খসে পড়ে অদ্ভুত দীন অবস্থা।

অল্প সময়ের মধ্যে ডাঃ দাসের গাড়ীটাও এসে পড়ল। তারপর বাগানের দিকে একটা জায়গা বেছে নেওয়া হলো। সোনামণিবাবু শ্যাম আর রামসিংকে নিয়ে উনুন বানানো থেকে শুরু করে সতরঞ্চি আর চেয়ারগুলো পাতার বন্দোবস্ত করতে লেগে গেলেন।

দীনেন ঠোঁটে সিগারেট জ্বালিয়ে বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। যদিও প্রকৃত বিষয়টি তার বিশেষ মনঃপুত হয় না কখনও, তবু গাছ গাছালি বা কুঞ্জবনের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াতে মন্দ লাগছিল না তার, দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে যাচ্ছিল।

সকালের রোদ বা আকাশ, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চেহারা নিচ্ছিল। দীনেন লক্ষ্য করে দেখল সেখানে রোদের রংটা তামাটে দেখাচ্ছে। প্রকৃতির রাজ্যে হাওয়া রোদ বা আকাশের রং ও চরিত্রের এই নির্ভেজাল রং বদলান তার বেশ ভালই লাগছিল। সকলের চা জলখাবার ডাক পড়ল তখন। দীনেন গিয়ে দেখল সতরঞ্চির উপর জাঁকিয়ে বসেছেন মহিলারা আনাজ পত্রের ঝুড়ি খুলে নিয়ে। ডাঃ দাস একটা বেতের মোড়ায় বসে পাইপ টেনে যাচ্ছেন, বাচ্চা দু'টো ঝোপের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। মুখার্জীবাবু মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে সতরঞ্চির উপরে বসে, মানব উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে, সোনামণি-বাবু আর শ্যামলকে দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। রমা, রমলা, আর বীণা চা জল খাবারের প্লেটগুলো সাজাচ্ছিল।

—না দীনেন তুমি একেবারেই কোন কাজের নও। ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছ কেবল! বিমলা নন্দী ভ্রূ তুলে বললেন।

—বেশ আর না হয় ঘুরবো না, বলুন কি কাজ করতে হবে। দীনেন বেশ সিরিয়াস মুখেই বলল।

—যাক, তোমাকে আর কোন কাজে হাত দিতে হবে না। তোমাদের

মতো আর্টিষ্টদের তো জানি। কাজে হাত দিলেই ভণ্ডুল করে দেবে। হাসিমুখে কাকিমা বললেন ডাঃ দাসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।

দীনেন চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনল সোনামণিবাবু আর শ্যামল গাঁয়ের হাটে গেছে মাছের খোঁজে। এতগুলো ফাউল আছে আবার তার উপর মাছের কি দরকার? বললেও কথা শুনবেন না, যা মনে আসবে তাই করবেন ভদ্রলোক।

মিসেস বোস কিছুটা বিরক্তির গলায় বললেন—তা ভদ্রলোকের কি দোষ বল উনিতো আগে জানতেন না ফাউল জিনিসটা কেমন।

কুঞ্জবনের নরম মাটি আর ঝরা পাতা, কত বড় বড় ঘাস। বাগানের গাছপালার জটলার মধ্যে রোদ এসেছে, সেই রোদ দেখলে অনেকটা জালি দেওয়া হলুদ ফলার মতন দেখায়।

আসন্ন শীতের স্পর্শ লেগেছে এখানে। অদ্ভুত সুরে কোথাও যেন একটা পাখি ডাকছিল চিকি···ব···চিক·· চিকির। দূর থেকেও দীনেন বেশ শুনতে পাচ্ছিল ওই কাকিমাদের আসরে খুব হাসাহাসি চলেছে। রমা যেন কাকে গলা তুলে ডাকল। তার চিকন গলার ডাক বনের বাতাসে ভেসে ভেসে অনেকটা ছড়িয়ে পড়ল।

.—পছন্দ নয় তোমার। অগত্যা মাছের খোঁজে যেতে হল।

চাপা ঠোঁটে অদ্ভূত একটা বাঁকা হাসি ছড়িয়ে বিমলা নন্দী কথাটা বললেন। চাপা গলায় তারপর কনুই দিয়ে কাকিমার পিঠে একটা খোঁচা দিলেন। দীনেন লক্ষ্য করল মহিলাদের মধ্যে তার কথায় একটা চাপা হাসির সাড়া পড়ে গেল। মিসেস বোস ওদের হাসির কারণটা বুঝে আরক্তমুখে আলু কুটতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দীনেন উঠে অন্যদিকে গেল। রমলা আর বীণা উঠে পড়ল। ওদের খুব ভাল লাগছিল গাছের তলায়।

দীনেন একপলক ভাবল আমি পালাব কেন? সব কিছুর মুখোমুখি হতে পারছি না? সুস্থভাবে পুরোপুরি একজন সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে পারার ধারণাটি কেন আমার মনঃপূত হয় না? অথচ

কি চাই, কি ভাবে তা পাবো জানি না। যদি এই সংসারটা একটা রণক্ষেত্র হয় তা হলেও তো আমার প্রথম চেনা দরকার, কে কে আমার শত্রু, কার বিরুদ্ধে লড়বো আমি। কোন ছিদ্রপথেই বা আমার বিপদ আসবে। হয়ত আমার চারপাশে কোন কিছুই হচ্ছে না ? মিছামিছি আমি কেবল নিজের আত্মরক্ষা করে চলেছি, কেন ? বৃথাই কেন এত আয়োজন, কেনই বা নির্যাতন ?

দীনেন হাঁটতে হাঁটতে পুকুরে ধারটায় এসে পড়েছিল। বাঁধানো ঘাট মাথার উপর লতাপাতার ছাউনি দেওয়া, ঘাটের তু'পাশে বসবার আসন। বেলা হয়ত সামান্য বেশী হয়ে গেছে, তবু এই বাগানের মধ্যে খাঁ খাঁ রোদ চোখে না পড়ায় এবং গাছপালার ছায়ায় সময় যেন ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। কব্জি উল্টে দেখলো ঘড়িতে দশটা বাজে। এই সময় শ্যামল হাত ধুতে এলো ঘাটটায়।

—আরে এখানে একা একা কি করছেন ? হাসিমুখে বলল শ্যামল।

—কি করব, নিরিবিলিতে সুখে সিগারেট টানছি, জবাবে বলল দীনেন,—হাটে কিছু পেলেন টেলেন না কি ?

—না তেমন পাওয়া গেল না কিছু। শ্যামল জলে নেমে ঘসে ঘসে হাত পায়ের ময়লা ধুচ্ছিল।

—অন্য কেউ কিছু খুঁজে না পাক, আপনার তো তেমন হওয়ার কথা নয় শ্যামলবাবু !

—সকালের খেজুর রসের মতো একটা রসাল কিছু খুঁজে পাবেন এই রকমই তো আশা ছিল আমাদের। এলোমেলো ভাবে কথাগুলো বলল দীনেন। আসলে শ্যামলকে একটু খোঁচা দেওয়ার ইচ্ছা করছিল তার অকারণে।

শ্যামল কিছু বলল না প্রথম, একবার হাসিমুখে তাকাল দীনেনের দিকে, তারপর সহজ গলাতেই বলল—কার ভাগ্যে যে রসাল কিছুর

প্রাপ্তি ঘটে কে জানে দীনেনবাবু! আমাদের পাওনাগুলো তো আর ঠিকুজী কুষ্টির হিসেব মিলিয়ে আসে না সব সময়।

কথাটা শেষ করেই শ্যামল ওদিকে চলে গেল, ভীষণ খারাপ লাগল দীনেনের। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, দেখল মানব আসছে রমলার সঙ্গে একটা বাচ্চাও আছে দলে। ওরা কলকল করে এসে সিঁড়ি ধরে জলের দিকে নেমে গেল। অনিচ্ছা সত্বেও দীনেনকে যোগ দিতে হলো ওদের সঙ্গে।

মানব জলে হাত দিয়ে বলল, উঃ কি ঠাণ্ডা জলটা দেখেছো রুমি, যেন ফ্রিজের জল।

—পুকুর আছে জানলে সুইমিং ট্রাংকটা নিয়ে আসতাম। বেশ মজা করে সাঁতার কাটা যেতো, রমলা পায়ের পাতা দুটো নামিয়ে দিয়েছিল জলে, ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে বসল।

—এ পুকুরে আর তোমার সাঁতার কাটতে হচ্ছে না। কি গভীর দেখেছো। তোমার সাঁতারের দৌড় তো ঐ সাউথ ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের এক হাঁটু জলের ডোবাটা পর্যন্ত।

মানব পুকুরের গভীরতার দিকে চোখ রেখেই রহস্য করে বলল।

—কিছু না জেনেই কথা বলছো তুমি, জানো আমি আজকাল ট্রেনার ছাড়াই লেকের মাঝখান পর্যন্ত সাঁতার কাটি রোজ। উষ্ণ গলায় জবাব দিল রুমি।

—বেশ তুমি না হয় পাকা সাঁতারু। এখন চলতো সব, রান্নার কাজটা কতদূর এগুলো দেখি। হাসিমুখে রমলার দিকে তাকিয়ে দীনেন বলল তারপর। বাচ্চা দুটোর হাত ধরে পাড়ে উঠে এল।

পথের একপাশে দু'তিনটে বুনো কুলগাছ ওপাশে একটা নিম, এপাশে ওপাশে অন্য সব ছোট গাছের ঝোপ। গাছ গাছালির আড়ালটুকু পেরিয়ে আসতেই পিকনিকের দলটা চোখে পড়ে। আগে খেয়াল করে দেখেনি, এবারে ভালো করে লক্ষ্য করল দীনেন। কাঁঠাল ও আম গাছের ঘন ছায়ার ভেতর রান্নাবান্নার হুলুস্থুল চলেছে দু'দুটো

উনুন জ্বলছে। হাঁড়ি, কড়া, হাতা, খুন্তি, মাটির সরা আর অন্য সব বাসনপত্র ছড়ানো, কলার পাতা, মাটির গেলাস পড়ে আছে, আর সেই সঙ্গে জলের ড্রাম আর বালতি। বিমলা নন্দী আর মুখার্জি গিন্নী কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত। মিসেস বোস, কাকিমা আর রমা ওদের হাতে জিনিষ পত্র তুলে তুলে দিচ্ছিল। বীণা আর ডাঃ দাস কথা বলছে মোড়ায় বসে।

সোনামণিবাবু, শ্যামল আর মুখার্জী মশাই সতরঞ্চিতে বসে মহিলাদের রান্নাবান্নার দিকে লক্ষ্য রাখছে। দীনেন তার দলটি নিয়ে আসরের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াতেই সকলে হৈ হৈ করে উঠল। সোনামণিবাবু বললেন—কি ভায়া! খিদের চোটে প্রকৃতির শোভাদর্শন মাথায় উঠল নাকি?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে রঙ্গ করে তিনি কথাগুলো বলতে দীনেন হেসে ফেলল—তা যা বলেছেন। রান্নার গন্ধে খিদে যা পেয়েছে, তাতে নাড়ি ভুড়ি হজম হবার যোগাড়।

—বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফাঁকি মারছ, তোমার আবার খিদে কিসের? বিমলা নন্দী বললেন হাসিমুখে।

—এবার আর আমাকে ফাঁকি দেওয়ার কথা বলতে পারবেন না আপনি। এই শিশুদের পেছনে কি কম খাটতে হয়েছে না কি আমাকে। এই কেউ জলের ধারে গেল, এই কারো ঠ্যাং ভাঙলো গাছ থেকে পড়ে। এই সব কাজের ঝক্কি কি কম নাকি? বানিয়ে বানিয়ে নকল পরিশ্রমের ঢঙে কথা বলছিল দীনেন।

—যত বাজে কথা দীনেনদার। আমাদের জন্য তোমাকে এক ফোঁটাও ব্যস্ত হতে হয়নি। রসনা দীনেনের কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠল।

—বাজে কথা। মাগো কি মিথ্যেবাদী মেয়েটা। এই কানু, বলতো তুই? একজন বাচ্চাকে সাক্ষী রেখে দীনেন কথাটা বললে, আসরে হাসির ধুম পড়ে গেল।

আর একটু বেলা হতেই সারি সারি পাতা পড়ে গেল সব। পরিবেশনের ভারটা ছিল শ্যাম আর রামসিংএর উপর। দুপুরের দিকে রোদের তেজ কেমন হালকা হয়ে গিয়েছিল। সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত ছিল আর বেলা চড়ে গিয়েছিল বলে সকলেই বলামাত্র এক একটা পাতা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। হৈ চৈ করে খাওয়াটা শেষ হতে হতেই দুপুরটা গড়িয়ে গেল খানিক। বাগানের ভেতর মধ্যাহ্ন বেলায় রোদটুকু উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। বাতাসে কেমন একটা শীতের আমেজ ধরা দিয়েছে, গাছপালার পাতা কাঁপছিল। অনেক-গুলো কাক রান্নার জায়গায় এসে ভীড় করছে—ডাকছে। ঘুঘুর উদাস ডাকও শোনা যাচ্ছিল। কোথা থেকে একটা রোগাটে চেহারার কুকুর এসে জুটেছে, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে উচ্ছিষ্টের ডাঁই পাওয়ার আশায়।

খাওয়া দাওয়ার পর দলের বয়স্করা পান মুখে দিয়ে খেলায় মাতলেন। শ্যামল রমা, মানব, রসনা, আর বাচ্চার দলটাকে নিয়ে গ্রামের দিকে বেড়াতে গেল। দীনেন তাদের আসরটার পাশে বসে খেলা দেখছিল একসময় উঠে পড়ল। পুকুর ধারের আমবাগানটার দিকে তার মন টানছিল। ও দিকটা একবারও দেখা হয়নি। দীনেন পথ হাঁটতে হাঁটতে নিঃশ্বাসে ঘাসের এক ধরণের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল। হয়ত এই গন্ধ এই বাগানের ভেতর রোদ ফিকে হয়ে আসায় গাছ গাছালির থেকে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। এই সময় একটা ঘুর্ণি বাতাসের দমকা এল, কিছু ছুটকো পাতা আর খড়কুটো উড়ে গেল। উড়ে উড়ে সেগুলো গাছের মাথায় হারিয়ে গেল, দীনেন ঐ মজার দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন সময় পেছনে শুনল কে তাকে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাস্তা দিয়ে বীণা দ্রুত পায়ে আসছে।

—কোথায় যাচ্ছ দীনেনদা ?

—ঐ ধারটা দেখা হয়নি ভাল করে।

—চল আমিও যাবো।

রোদের ভিতর হাঁটতে লাগলো দুজনে। সামান্য দূরেই আম-বাগানটা।

দীনেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বীণা এগিয়ে গিয়েছিল কয়েক পা, দীনেনকে থেমে যেতে দেখে দাঁড়ালো। তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে।

—কি হল ?

দীনেন পাশের ঝোপ ঝাড়ের দিকটা নীচু হয়ে লক্ষ্য করছিল কোন কথা বলল না। বীণা ভাবল দীনেনের পায়ে বোধ হয় কিছু ফুটেছে। বাগানটায় ফুল গাছ আছে কয়েকটা। দু'পা পিছিয়ে এসে বীণা আবার জিজ্ঞাসা করল।—কি কাঁটা ফুটল নাকি ?

দীনেন তাকে আঙুল তুলে চুপ করতে বলল। বীণা খানিকটা অবাক হ'য়ে দীনেনের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। চলতে চলতে হঠাৎ ঝরা পাতার উপর একটা ক্ষীণ সর সর শব্দ শুনতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিল দীনেন। বলা যায় না সাপ টাপ হওয়াও বিচিত্র নয়। ভালো করে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে সে সব কিছু না পেয়ে, দীনেন মুখ তুলে বলল,—মনে হয়েছিল সাপটাপের ব্যাপার।

—তা হলে তো বেশ ভয়ের ব্যাপার দীনেনদা।

বীণা ছেলেমানুষ ধরণের মুখ করে কথাটা বলতে দীনেন হেসে ফেলল।

—তা ভয় তো আছেই। কি করবে, ফিরে যাবে নাকি ?

—না আমার অত ভয় নাই তোমার মত।

নিরিবিলি ঝোপ জঙ্গলে গাছ আর ছায়া দিয়ে দিয়ে বীণা হেঁটে যাচ্ছিল। হলুদ জমির উপর ফুল আঁকা শাড়ীতে এই বাগানের আলোছায়ার ভেতর অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। দীনেন দু'দণ্ড দেখল তাকে। বীণা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে গাছ-গাছালির ভেতর একসময় হারিয়ে গেল। দীনেন তাকে দেখতে পাচ্ছিল না আর, সামনে ছোট ছোট খেজুর গাছ উঁচু ঢিবির মত জমির ওপর সার

বেঁধে দাড়িয়ে আছে। আশে পাশে বুনো লতা, ফুল, আমলকী আর কাঁটা গাছ। চিক চিক···কুরর্···কুরর্ বুনো পাখির ডাক আসছে। আর সব নিঝুম। গাছ-গাছালির গন্ধে বুনো ফুলের গন্ধ মিশে বাতাসটা ভারী, আর নির্জনতা দীনেনবাবুকে চেপে বসছিল যেন। সে গলা তুলে ডাকল।

—বীণা···এই বীণা।

তারপর সাড়া না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আতা গাছটার তলায় এসে দেখল বীণা চুপ করে বসে।

—খুব মেয়ে যাহোক।

বীণা হাঁটুতে চিবুক রেখে ঘাড় গুঁজে বসেছিল, দীনেনের কথায় মুখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামাল আবার। তারপর হাত দিয়ে মাটির উপর থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ল সামনের ঝোপটা লক্ষ্য করে।

—আমি তো না দেখে ভেবেছিলাম হারিয়ে গেলে না কি।

দীনেন ওর পাশে বসতে বসতে বলল। বীণা কোন কথা বলল না। যেমন বসেছিল তেমনি আনমনার মত বসেই রইল। দীনেন আর কথা বাড়াল না, ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর কেমন ঝিমুনী লাগছে তার। গাছের গুঁড়িটায় হেলান দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালো। তারপরে একমনে ধোঁয়া টানতে লাগলো। এত চুপচাপ যে মনটা আপনা থেকেই কেমন হু হু করে উঠে। খানিক পরে বীণাই প্রথম কথা বলল।

—এ দিকটা এমন নির্জন যে মন খারাপ হয়ে যায় অযথাই।

—তা তো হবেই। তোমরা সহরে মেয়ে, হৈ-হট্টগোল, ট্রাম বাসের শব্দ ছাড়া থাকতেই পারো না। এখানে তোমাদের মন টিকবে কেন?

—আমি কি সেসবের জন্য মন খারাপের কথা বললাম। এখানের মন খারাপটা অন্য ধরণের।

—তাই নাকি? মন খারাপের আবার স্থান কাল ভেদে পার্থক্য আছে নাকি? গম্ভীর সুরেই কথাটা বলল দীনেন।

—অতো আমি জানি না। অন্য রকম জানা ছিল বললাম।

দীনেন বুঝল তার ঠাট্টায় ক্ষুব্ধ হয়েছে বীণা।

—রেগো না বীণা, আমি তোমাকে বুঝতে চাইছিলাম, তোমার বয়সী মেয়েদের মুখে ওসব সুখ-দুঃখের কথা শুনতে আমার একদম ভালো লাগে না। আর কথাগুলো তেমন মানায় না তোমাদের মুখে। তোমরা এখন শুধু হাসবে খেলবে আর খেলার পুতুল হারিয়ে গেলে কাঁদবে। তোমাদের এখন ঐ মনের ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। ওসব তো আসবে আমাদের মত বয়স হলে।

আন্তরিক ভাবে কথা বলছিল বলে দীনেনের গলাটা গাঢ় শোনাচ্ছিল। আর তার কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বীণা বলে উঠল।

—তুমি খালি আমাকে ছোট ভাবো কেন বল তো। জান, কত বয়েস হয়েছে আমার?

—তা আর জানি না, একেবারে পাড়ার ঠানদিদির বয়সী তুমি।

দীনেন আবছা ভাবে হাসল একটু।

—সে তুমি যতই ঠাট্টা করো দীনেনদা। সমস্ত কিছু বুঝবার মত বয়েস হয়েছে আমার। গম্ভীর মুখে বলল বীণা।

—বেশ এখন থেকে কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করব।

সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ হাতে ধরা ছিল। দু-আঙুলের টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিল সেটা। তারপর বলল—চল ওঠা যাক, ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করতে হবে আবার।

বীণা উঠে দাঁড়ালো, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলল আগে আগে।

দুপুরের আলোটা বিকেলে মিশে কেমন যেন সরে সরে এসেছে।

গাছগাছালির ছায়ার রঙ গাঢ় হতে শুরু করেছে। পুকুরটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বীণা দীনেনকে লক্ষ্য করে বলল—এক মিনিট দীনেনদা ! পা-টা একটু জলে ধুয়েনি।

দীনেন অন্যমনস্ক হয়ে পেছন ফিরে একটা অদ্ভুত . কাঁটাওয়ালা গাছ দেখছিল। বীণার কথাটা কানে যেতেও মুখ ফেরাল না। গাছটার গড়ন অদ্ভুত। আগে লক্ষ্য পড়েনি। আর পেছন ফিরে তাকাতেই প্রথম চোখে পড়ল তীব্র লাল ধরণের এক রকমের লাল থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে। দীনেনের ইচ্ছা করছিল একবার গাছটার কাছে গিয়ে ফুলের রঙটা ভাল করে দেখে। কিন্তু তার আগেই বীণার আচমকা চীৎকারটা শুনল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার আগেই আর একবার বীণা তার নাম ধরে অসম্ভব আর্ত চিৎকার করল। এমন ভয়াবহ সেই চিৎকার যে চারপাশটা শিউরে ওঠে। এতটা দূব থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, শুধু দেখা গেল বীণার একটা হাত বুকের উপর, অন্য হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা শরীরে ভয়ের ছাপ। দীনেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে থমকে গেল। বীণার পায়ের থেকে তিন চার হাত মাত্র দূরে একটা সাপ ফণা তুলে আছে। শেষ বিকালের আলোয় সাপটার শরীব চকচক করছে। কি করবে ভেবে পেল না দীনেন। এপাশ ওপাশ চোখ বাড়িয়ে কিছু খুঁজল। একটা ভাঙা কঞ্চি বা ইঁটের টুকরোও দেখা গেল না। বীণা পাথরের পুতুলের মতো স্থির। সাপটা অল্প অল্প দুলছে। বীণার সমস্ত মুখটা কুঁচকে ছোট হয়ে আসছে, ঠোঁট দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁপছে।

দীনেন নিজের পায়ের কাপড়ের ভারী জুতোটার দিকে তাকালো। যা করবার এই মুহূর্তেই করতে হবে। সাপটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করে দুলছে ও বাঁশের জঙ্গলটা থেকে ঘুঘুর উদাস গলাটা কানে আসছে। কলেজ টিমের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড দীনেন রায়ের ডান পায়ে এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন সেই সাবেকী ছুটন্ত বল সট মারবার সতর্ক

মারবার সতর্ক কৌশলটা ফিরে এসেছে। দীনেন আর দেরী করল না শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ে সংগ্রহ করে নিয়ে সাপটার দোলানো গলা লক্ষ্য করে একটা তীব্র সট ঝাড়ল। ডান পায়ের সটটা মারবার মুহূর্তে আপনা থেকেই তার চোখের পাতা দুটো বুজে গিয়েছিলো। পরক্ষণেই চোখ খুলে দেখল ফণা পাকিয়ে সাপটা একটু দূরে ছিটকে পড়েছে। বীণা তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দীনেনের তখন ওর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবস্থা ছিল না। দীনেন জানত যে, যদি সাপটাকে মেরে ফেলা না যায়, তবে সে আবার হিংস্র হয়ে যেতে পারে।

সাপের শেষ রাখতে নেই—তারা আধমরা হলেও বেঁচে উঠে তেড়ে কামড়ায়।

বীণা তখন যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে।

দীনেন তা কিন্তু চেয়েও দেখল না—আসলে দেখার অবকাশও তখন তার ছিল না।

* * *

এক লাফে পায়ের গোড়ালিটা দিয়ে সাপটার মাথার দিকটা চেপটে ধরল মাটির উপর। তারপর প্রাণপণে কয়েকবার লেজের দিকটা মাড়ালো, সাপটা কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নড়ল। বারকতক ঝাপটা মারল দিনেনের পায়ে প্যান্টের উপর দিয়ে। এক সময় ফট্ করে চাপা ধরণের একটা শব্দ হল পায়ের তলায়, লেজের দিকটা ভারী হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে দীনেন গোড়ালিটা তুলল সাবধানে।

মাথার অংশটা ফেটে মাটির সংগে চেপটে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই। দীনেন পাশের ঝোপটা থেকে একটা ডাল ভেঙে মরা সাপটাকে পুকুরের জলের ভেতর ছুড়ে দিল। ব্যাপারটা ঘটল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, আর তার ভেতরেই টের পেল সে উত্তেজনায় তার গায়ের গেঞ্জিটার বুক পিঠ সব ভিজে গেছে।

ততক্ষণে বীণার জ্ঞান ফিরে এসেছে, আতঙ্কের ভাবটা কেটেছে। আচমকা সে দু'হাত বাড়িয়ে এবার দীনেনের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীনেন অনুভব করল বীণার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। ঘোর বিকেলের আলোছায়ার মধ্যে ঐ রকম অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে দীনেনের শরীরের ভেতরটাও কেমন করে উঠল। কয়েক মুহূর্তে তার সমস্ত শরীর প্রতিরোধ, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা চূর্ণ হয়ে, ভেঙে চুরে একেবারে ছত্রাখান হয়ে গেল ভেতরটা। আপনা থেকেই তার দুটো হাত বীণার কাঁপতে থাকা ভয়ার্ত শরীরটাকে বেষ্টন করে ধরল।

—পাঁচ—

বিকেলে চারটে নাগাদ টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল দীনেনের। আজ সারাদিনই তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। অকারণে একটা রাগভাব মত ব্যাপার হল মিঃ বোসের সঙ্গে। দীনেনের সমস্ত শরীর মিশ মিশ করছিল রাগে। এদিকে একটা যে আউট পছন্দসই হচ্ছিল না সেই সকাল থেকে, বরং পেনসিলের সমস্ত রেখাগুলো তালগোল পাকিয়ে কিম্ভুত কিমাকার হয়ে যাচ্ছিল। টেলিফোনটা বেজে উঠতে রাগটা আরো খানিকটা চড়ে গেল।

এক মুহূর্ত আগে একটা নূতন ধরনের আইডিয়া ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল মাথার ভেতর। দীনেন দু'চোখ বুজে সেটাকেই মনে মনে গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল। ঠিক তখনই টেলিফোনটা বাজল। রাগে তার সমস্ত শরীরটা টেলিফোনটা ধরবার সময় যেন খানিকটা বেঁকে গেল।

—হ্যালো রায় বলছি।

টেলিফোনে নিজের গলাটা কর্কশ শোনালো দীনেনের কানে।

—দীনেন! আমি তোমার বিনয় কাকাবাবু বলছি। বলেই কণ্ঠস্বরটা

থামলো, দীনেন তার মধ্যেই গলা ও শরীরের রাগী ভাবটা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করল। গলাটা যথাসম্ভব কোমল করে বলল—বলুন কাকাবাবু।

আজ বড় একটা মুস্কিলে পড়ে গেছি দীনেন। টিফিনের পর ড্রাইভারের বাড়ী থেকে একটা দুঃসংবাদ এল বলে আজ ওকে সারাদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিতে হলো। এখন সমস্যা হল বীণা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরবে কি করে! কেমন জড়ানো গলায় থেমে থেমে কথা বলছিলেন তিনি। তুমি যদি আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ওকে নিয়ে বাড়ী যাও, তাহলে ভালো হয়। আমার আবার আজ সন্ধ্যেয় একটা পার্টি আছে।

কথাটা মুখস্থ বলার মত শোনাচ্ছিল তার।

আমি যদিও ইতিমধ্যে বীণাকে ফোন করে দিয়েছি তুমি যাচ্ছ বলে, এই ধরো সাড়ে চারটে নাগাদ পৌঁছলেই চলবে। ওকে আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি।

দীনেন তার কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে উঠতে পারছিল না। আজ সুনীলদের সঙ্গে একটা জায়গায় যাবার কথা ছিল সন্ধ্যায়। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিনয়বাবুই আবার বললেন।

—হ্যাঁ শোনো, তোমার কাকীমাকে বলে দিও আজ বোধহয় আমার বাড়ী ফেরা হবে না। বেশী রাত করে আবার আমাদের ওদিকটায় ফেরা ঠিক সেফ হবে না। সঙ্গে আবার আমার কিছু টাকা আছে। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেই ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। দীনেন শুনল ফোনের ভেতর ঘ-র-র—ঘ-র-র শব্দ হচ্ছে। এবার বেশ শব্দ করেই ফোনটা নামিয়ে রাখল সে। যেন একটা সোনার বিকেল তার মাটি হয়ে গেল। এখন ছোট গৃহকর্তার কন্যাটিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেবে।

দীনেন ডান হাতে ধরা পেনসিলটা শব্দ করে টেবিলের উপর ফেলে দিল একটানে। ফর্ ফর্ করে ছিঁড়ে ফেললো ড্রইং প্যাডের

পাতাটা। পায়ের ধাক্কায় টেবিলের অসার কাগজ ফেলার ঝুড়িটা উল্টে ফেলে দিল। একবার বাঁ হাতের কাছে তুলি ভেজানো জলের বাটিটাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিতে ইচ্ছে হল। সে সব ইচ্ছাকে দমন করে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশালাই জ্বালালো শব্দ করে, অসাবধানে আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগল। তারপর এক মুখ ধোঁয়া টানতে টানতে মনটা একটু শান্ত হয়ে এলো। সে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল। উলের মাফলারটা চেয়ারের পেছনে ঝোলান ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটা কাঁধের উপরে ফেলল, ড্রয়ার টেনে সিগারেটের প্যাকেট আর মানিব্যাগ পকেটে পুরল, তারপর এক পলক বিশৃঙ্খল টেবিলটার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে দীনেন যখন স্কুটারটায় চাপল, তার হাত ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ঠিক সময় পৌঁছানোর কোন তাগিদ তেমন করে অনুভব করতে পারছিল না। বরং ভেতরের বিরক্তির ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তারপর বীণার কাছে গেলেই ভাল হয়। ফলে খুব মন্থর ভাবেই সে অসহ্য ভিড় বাতাসের ঝাপটা ও তির্যক সূর্যের প্রখর ছায়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ভাবল সে বার বার, বীণাকে এড়াতে চাইছে বলেই কি প্রতিবারই বিভিন্ন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, এমনি করে নাকি জীবনের গতিটাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে বীণার দিকে? ভেতরে ভেতরে ভীষণ অসহায় বোধ করল দীনেন, ধর্মতলার মোড়টা পেরুনোর সময়। বীণাকে নিয়ে এখন আমি কি করব? ওকি আমার জীবনের যাবতীয় গূঢ় সমস্যা বা শূণ্যতার অবসান ঘটাতে পারবে। কেবল-মাত্র একটি মেয়ের নশ্বর শরীর বা আন্তরিক প্রেম ভালোবাসা পেলেই কি আমি তৃপ্ত হব? বীণা বুকের ভেতরের শ্বাসকণ্ঠ রোধ করে আস্তে আস্তে ভাবল দীনেন তুমি কি আমার সেই জন, যার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আমি চেঁচিয়ে বলতে পারব—বাঁচাও আমাকে, কিংবা বলতে পারব মারো আমাকে। ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাতের নির্দেশে

মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে দীনেন দেখল তার ডানপাশে বিশাল ময়দান, বাঁ পাশে অসহ্য ভীড়ের ফুটপাত, সুদৃশ্য দোকান, সিনেমা হল, শেষ বিকালের আলো দেখে সব কিছুই অবাস্তব অলৌকিক। একবার যেন মনে হলো দীনেনের সমস্ত কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে গলা ফাটিয়ে বলে ওঠে—আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী। আমি দীনেন, সেই পলাতক, যে জন্মের মূহূর্ত থেকে বিভিন্ন ছদ্মবেশে আপনাদের সকলের চোখ এড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি সেই লোক যার শরীরে গত জন্মের পাপ অভিশাপ ও প্রহারের চিহ্ন জ্বলজ্বল করে ফুটে আছে, দেখুন আপনারা, চিনে রাখুন আমাকে। আমার দু'হাতের নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাব আপনাদের সমস্ত সম্পদ। সংবিধান পবিত্রতা নইলে আমি সব কিছু আমার কলুষ স্পর্শে উচ্ছিষ্ট করে দেব, ভেঙে ফেলব আপনাদের সবগুলি তোরণ। ছিঁড়ে ফেলব আপনাদের কেতন। প্লীজ অন্য কিছু না পারলে বীণাকে অন্তত আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ওকে এমন ভাবে নষ্ট হতে দেবেন না—প্লীজ।

দীনেনের মনে হলো সে যেন স্কুটারটা থেকে টলে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ার্ত হয়ে সে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিল। মুখের ভেতর হঠাৎ এক ঝলক তেতো জল উঠে এল পাকস্থলী থেকে, কষ বেয়ে গড়িয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে দিল। দীনেন বেশ স্পষ্ট বুঝল আজ টিফিনে ঐ টক্‌টক্ ঘুগনিটা খাওয়া তার ঠিক হয়নি, ওটা খাওয়ার পর থেকেই শরীরটা যেন কেমন লাগছিল, তলপেটে বাতাস জমতে শুরু করেছে। সেই সময় ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলতেই আবার তার যাত্রা শুরু করল।

পরিচ্ছন্ন গলিটায় এসে দীনেন খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল। মাথা বা শরীরের ভেতরটা অনেকখানি ঝরঝরে লাগল। শহরের এই এলাকাটার এক অদ্ভুত মান আছে, এমন চওড়া রাস্তাঘাট, এমন সুদৃশ্য সব দোকান, রেস্তোরা বা বার লোকজনের চেহারা বা পোষাক-

গুলোও সুন্দর, দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে তোলে বুকের ভেতর দোলা লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যের দিকে এদিককার রাস্তাগুলোর হোটেলে এলে আপনা থেকে যে কোন লোকের মন ভাল হয়ে যায়। নিজেকে যে কোনো রাজপুরুষের মতই মনে হয়।

রাজার কুমার হয়ে পথ হাঁটি। দীনেন ভাবল স্কুটারটার স্পীডটা কমিয়ে আনতে আনতে। কলেজের গেটের কাছে দাড়িয়ে ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে কলরব করছে। দীনেন তাদের দিকে তাকিয়ে কায়দা করে একটা সিগারেট ধরাল। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে সারি সারি মোটর দাড়িয়ে। ঝাঁক থেকে ছিটকে গিয়ে দু' একজন করে এক একটা গাড়িতে উঠে বসছে, জানালা দিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। তারপর চলে যাচ্ছে। পোড়া পেট্রোলের গন্ধে বাতাসটা ভারী।

* * *

ঝিরঝিরে একটা বাতাস দিচ্ছিল থেকে থেকে। দীনেন দেখল ভীড়ের ভেতর থেকে পেরিয়ে রাস্তাটা সরাসরি ক্রশ করে বীণা এগিয়ে আসছে।

জংলা ধরণের একটা শাড়ি পরণে, সেই সঙ্গে মানানসই ধরণের একটা ব্লাউজ, কপালের উপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা একটা ঘুরণি। থেকে থেকে পেছন ফিরে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছে। কাছে আসতেই বীণা একটু উচ্ছল গলায় বলল—এত দেরী করলে, আমি তো সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে।

তারপর হাতের চটি বই আর ব্যাগটা ধরে সাবলীল ভাবে সিটের পেছনে উঠে বসল। দীনেন আধ খাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতোর গোড়ালি ঘষে নিভিয়ে সিটে বসলে, বীণার একটা হাত এসে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে যাবার আগেই কোমরের দিকটায় অদ্ভুত ধরণের একটা শিরশিরাণি ভাব টের পেল দীনেন। শরীরের মাঝখান থেকে উঠে সেটা

লক্ষ্যহীন বলের মতো যেন ভেতর দিকটায় গড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও উপরের দিকে কখনও বা তলায় নামছে। দীনেন সাবধানে গাড়ীর মুখটা ঘোরালো, বিকেলে এই সময় রাস্তাঘাটে গাড়ী, মানুষজনের এমন উত্তাল ভীড় থাকে যে নিজের গাড়ী নিয়ে সাবধানে পথ ধরে চলাটা বেশ দুস্কর হয়ে ওঠে। বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় নামতেই দীনেনকে ব্রেক কষে গাড়ীটা থামিয়ে দিতে হল। মোটর গাড়ীর ভীড়ের ভেতর রাস্তা জুড়ে একটা মিছিল যাচ্ছে। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ভালো করে চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা যাচ্ছে, ফেটুনের লাল রঙ ও শ্লোগানের উত্তেজক ধ্বনি মিলে-মিশে দীনেনকে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছিল। সে বীণাকে লক্ষ্য করে বলল, —নামো।

তারপর কোমরের কাছ থেকে হাতের ছোঁয়াটা সরে গেল, সে মাটিতে দু'পা ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ীটার মুখ ঘুরিয়ে সাবধানে ফুটপাতের উপর তুলে আনে। বীণা তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। দীনেনকে ফুটপাতে উঠে যেতে দেখে সেও পেছন পেছন এল।

এখন আর কিছুক্ষণ গাড়ী নিয়ে বেরুণোই যাবে না, অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

তারপর পাশে তাকিয়ে কাঁচ বসানো সুন্দর রেঁস্তোরাটা দেখে বলল—চল একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। তার মধ্যে রাস্তাঘাট পরিস্কার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বীণা তার কথার কোনো জবাব দিল না। দীনেনের সঙ্গে রেস্তোঁরার কাঁচের পাল্লা দেওয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গেলেই, দারোয়ান দরজাটা খুলে সেলাম করে দাঁড়াল। প্রথমে বীণা তারপর দীনেন ঢুকে গেল রেঁস্তোরায়।

ভেতরে তখন রেডিওগ্রামে এক অদ্ভুত ড্রামের বাজনা দমকে

দমকে বাজছে। আলো-ছায়াময় লম্বা ঘরটা। প্রায় প্রতিটি টেবিলেই ছেলেমেয়েরা বসে আছে। দীনেন ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধ করল। কি দরকার ছিল এখানে ঢোকার, না হয় তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খানিকটা সময় অপেক্ষা করত।

দোকানের সমস্ত পরিবেশটাই তার কাছে বিচ্ছিরি লাগছিল। এই ধরণের অশিক্ষিত ইংরেজী বলা ভীষণ অসহ্য। পুরোপুরি কোনোটা নেই, শুধু পাঁচমেশালি কিম্ভূত কিমাকার মিশ্রণ এক। হলঘরের এক পাশটায় ছেলেমেয়েদের নাচের জন্য খানিকটা জায়গা নির্দিষ্ট করা, তার পাশে উঁচু মতন ডায়াস। সামনে মাইকগুলো রেখে গুটি তিনেক লক্কা মার্কা চুলফোঁপানো এ্যাংলো ছোকরা বিশ্রাম করছে, নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টায় ব্যস্ত তারা। ওপাশে কাউণ্টার। দীনেন একবার আড়চোখে তাকাল বীণার দিকে। ওর চোখমুখ বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে, খুশী খুশী একটা ভাব খেলা করছে। এই সময় বীণা আঙুল তুলে ঘরের কোণার দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা খালি টেবিল দেখাল।

দীনেনরা কার্পেটের উপর পা চেপে চেপে দুপাশের টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আচমকা বীণা ঝুঁকে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল।

—এই গোপা। বলেই পাশের একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। দীনেন দেখল জনা-ছয়েক ছেলেমেয়ের একটা দল টেবিলটায় বসে ঝুঁকে পড়ে ভীষণ উত্তেজিত গলায় একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

ইউ নটি গার্ল এ্যাটেণ্ডিং ইয়োর ক্লাসেস্ হিয়ার। আই উইল টেল ইট টু ইয়োর মাদার।

বীণার কাটা কাটা স্বরটা দীনেনের কানে যাচ্ছিল। এতক্ষণে নিজস্ব পরিবেশ পেয়ে বীণা যেন ফুলে উঠেছে খানিকটা মনে হল দীনেনের।

তারপর আরো সব একগাদা বাক্য বিনিময় হল ওদের, হাসল গলা খুলে, দীনেনের কোন কথাই কানে যাচ্ছিল না। বীণা এল একটু পরে। ফাঁকা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে অর্ডার প্যাডটা। দীনেন বলল—কিছু খাবে তো?

—না আমার খিদে নেই।

কেমন আদুরে আদুরে গলায় বীণা কথা বলছে, দীনেন অনুভব করছিল।

—একটা কাটলেট খাও অন্তত।

বিনীতভাবে পাগড়ির ছায়ায় মুখ ঢেকে বুড়ো বেয়ারাটা দীনেনের অর্ডারটা নিয়ে চলে গেল, এতক্ষণ পর সে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর অলসভাবে চারপাশে তাকিয়ে সব কিছু দেখতে লাগলো, বধ্যভূমিতে আনিত অসহায় প্রাণীর মতই সে তখন আর কোন উদ্বেগ বোধ করছিল না। কাউণ্টারে হেলান দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা মেয়ে চেয়ারে বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলছে, দীনেন দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিল মেয়েটির কালো মুখ, বেশী পাউডার কিংবা রঙ মাখা বলে মুখটা কেমন ছাই রঙা রক্ত শূন্য দেখাচ্ছে। রুখু চুল উঁচু চোয়াল মেয়েটির। জোরাল শরীরটার আর কোন অংশ তেমন দেখতে পাচ্ছিল না দীনেন।

—তুমি কি আফিসে বলে ছুটি নিয়ে এলে না এমনিই কেটে পড়েছো।

খুব খুশি গলায় বীণা কথা বলল।

—তোমার কি মনে হচ্ছে?

—আমার আবার কি মনে হবে। আমি কি তোমার আফিসের নিয়ম কানুন জানি নাকি?

কথা শেষ করে ছেলেমানুষী ধরণের হাসল বীণা। আর তাতেই কেমন অন্যরকম দেখাল তার মুখটা দীনেনের চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল। হঠাৎ-ই কোন রহস্যময় কার্যকলাপ

সূত্রেই মনে পড়ল দিন দুয়েক আগে লাইট হাউসে ওজন যন্ত্রটায় নিজের ওজন নেবার পর তার হাতে যে টিকিটটা পড়েছিল, তার ওপিঠে লেখা ছিল বিপদ এড়িয়ে চলুন, এখন থেকে সাবধান হোন।

কথাটা এই মুহূর্তে মনে পড়তেই দীনেনের বুকটা অকারণেই দুর দুর করে উঠল। সিগারেটের তীব্র ধোঁয়া তার গলার স্বরনালীতে ও বুকে দয়াহীন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। সে নিজেকে সুক্ষ্মভাবে সচেতন করে নিতে চেয়ে চোখ তুললে, দেখল বীণা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—কই আমার কথার জবাব দিলে না তো?

দীনেন মুখটা তুলতেই বলল সে।

—কি বলব?

—সত্যি কথাটা বলবে কিন্তু, আফিস থেকে না বলে পালিয়ে এসেছ না ছুটি নিয়ে এসেছ?

—না বেরুবার সময় বলা হয়নি কাউকে। তোমার বাবা ফোন করলেন চারটের পরে। হাতে তখন সময় ছিল না বেশি, তাই কাউকে না বলেই চলে আসতে হলো।

ঠিক আমারও তাই মনে হয়েছিল। তোমার মুখচোখে যেরকম অপরাধী ভাব ছিল তাতেই বুঝছিলাম আমি। বীণা বেশ জোরে হেসে উঠল এবার। দীনেন কিছু বলল না। কাউণ্টারের মেয়েটী সরে গেছে কখন, সে জায়গায় শিরাবহুল ফর্সা একটা হাত পড়ে আছে। দূর থেকে হাতটাকে প্রাণহীন মনে হচ্ছিল দীনেনের। পরক্ষণেই আবার মনে হলো কাউণ্টারের ওই হাতটা বোধ হয় অপেক্ষা করছে কেউ এসে তাকে তুলে নেবে বলে। দীনেন ভেতরে ভেতরে ভীষণ ছটফট করে উঠল। ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে তাদের টেবিলে খাবারের প্লেট ও চায়ের পট রাখল। আর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তীব্র সুরে বেজে উঠল বাজনাটা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে দীনেন খাবারের প্লেটে মুখটা গুঁজে দিল।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দমকে দমকে ছড়িয়ে যায় সুর। হাসি ঝলকে ওঠে, চঞ্চল শরীরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছেলেমেয়েরা নাচের নির্দিষ্ট জায়গাটাতে জড়ো হয়ে দুলতে থাকে, দীনেনের কণ্ঠনালী বেয়ে কাটলেটের টুকরো, পেঁয়াজের কুচি, ঝুপ ঝুপ করে পাকস্থলী লক্ষ্য করে নেমে যেতে থাকে। কাউন্টারে হেলান দিয়ে বুড়ো বেয়ারাটা মায়াময় দৃষ্টি নিয়ে তালে তালে মৃদু মাথা দোলায়। দীনেন বেশ বুঝতে পারে পলায়নের সব রাস্তাগুলো সে ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছে। উন্মাদ ড্রামের শব্দ একবার সর্বোচ্চ গ্রামে উঠে হঠাৎ চূর্ণীকৃত ভগ্নাংশে লয় পেয়ে গেল, লম্বা হল-ঘরটা ভরে করতালির চট্ চট্ শব্দ হয়।

—কি হয়েছে তোমার দীনেনদা একদম কথা বলছ না কেন ?

জ্বলজ্বলে এক জোড়া চোখের দৃষ্টি তার দিকে ছুড়ে দিয়েই নামিয়ে নিল বীণা।

দীনেন তার কথার কোন জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আচমকা বলল—আজ কত তারিখ বলত বীণা ?

তার প্রশ্নে বীণা একটু অবাক হলো তারপর ভ্রূ কুঁচকে কি একটা হিসেব করল মনে মনে, তারপর বলল—আজ কুড়ি তারিখ। কেন বলত কোন কাজ আছে না কি ?

—কাজ, না তো ?

অন্যমনস্ক গলায় বলল দীনেন। এতক্ষণ ধরে মনের কোন গোপনে সন্দেহটা ঠিকই দানা বেঁধে উঠেছিল, কাঁটার খোঁচার মত খচ্ খচ্ করছিল। এতক্ষণে বিষয়টা স্পষ্ট হতে দীনেন নির্বিঘ্নে শ্বাস ফেলে হাসল। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল,—ঠিক যা ভেবে-ছিলাম, আজ আমার জন্মদিন না হয়েই যায় না।

ওমা তাই নাকি, তা বাড়িতে বলোনি কেন ? মা জানতে পারলে তোমাকে কেমন সুন্দর পায়েস রেঁধে খাওয়াতো, কত উপহার পেতে।

খুশিতে বীণার মুখটা অন্যরকম দেখাল।

নিজের জন্মদিনটা খেয়াল রাখবে তো ?

সেই কবে খুব ছোটবেলায় মনে নেই ভালো, মা বেঁচে থাকতে আমার জন্মদিনটা ঘটা করে পালন করা হতো বাড়ীতে। তারপর তো আর ওসবের পাট ছিল না, তাই আর জন্মদিনের কথাটা একদম মনে পড়ে না এখন। খুব অন্তরঙ্গ গলায় দীনেন কথা বললে, বীণার চোখদুটো ছল্ ছল্ করে উঠল।

প্রতিবছরই এই এই দিনে লক্ষ্য করে দেখেছে, তার জীবনে নূতন ধরণের কিছু একটা সর্বনাশ ঘটে। হয় কোন দুর্ঘটনা নয় অসুখ বিসুখ বা অন্য কিছু। বছরের এই দিনটা কিছুতেই সহজে নিরুপদ্রবে যেন কাটতে চায় না। কাল রাত্রে পুরাণো ডাইরীগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন হয় দীনেন প্রথম? তারপর স্মৃতি বা দিনপঞ্জীর তারিখ মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বিষয়টা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়। তুমি কি আমার সর্বনাশ? দীনেন ভাবল একপলক। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাবে বীণা আমি কি তোমার সঙ্গে নরক দর্শন করব, নাকি অনন্ত স্বর্গ!

কি জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা ফাঁকি পড়ায় দুঃখ হচ্ছে নাকি?

আবছা ভাবে এবারে বীণা হেসে উঠলে দীনেন ভয় পেল। বীণার হাসিটা ভীষণভাবে কাছে টানছিল দীনেনকে, তার শরীর ভ'রে একটা তীব্র ইচ্ছা জাগছিল, দু'হাতে ওকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে জীবনের প্রথম বা শেষবারের মত চুম্বন করতে। এতক্ষণে তার নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে এল গোপা, আঁটো স্কার্টে আর ছাঁটা চুলে তাকে রমণীয় দেখাচ্ছিল। তারপর আবার নাচের বাজনাটা বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে। গোপা চাপা স্বরে বীণাকে নাচবার প্রস্তাব করল। বীণা একটু লাল হয়ে মাথা ঝাকাল। গোপা দীনেনের দিকে তাকিয়ে বলল। ইউ—ইউ মাইণ্ড।

—সারটেন্‌লি নো। রাদার আই উড লাভ টু সি বোথ্ অফ ইউ ডানসিং।

দীনেন সহজ ভাবে হাসতে হাসতেই বলল কথাটা।

তার কথার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গোপা চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, বীণা একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল। তারপর একবার দীনেনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধরণের একটা লজ্জার হাসি হাসতে হাসতে এগোল।

চেয়ারটায় এবার বেশ করে গা ছড়িয়ে বসল দীনেন। গোপা বীণাকে টানতে টানতে নাচের জায়গাটায় নিয়ে যাচ্ছে, বীণা কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে বার বার পেছন ফিরে দীনেনের দিকে তাকাচ্ছিল। দীনেন প্রতিবারই ঠোঁটে হাসি নিয়ে তাকে উৎসাহ দিল। গোপার বন্ধু-বান্ধবীর দলটা ততক্ষণে নাচের জায়গায় ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। গোপা একবার গলা বাড়িয়ে বাজিয়েদের কি যেন বলল। ওরা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল।

আর দ্রুতপায়ে বেজে উঠল নাচের বাজনাটা। টুইষ্টের বন্য তীব্র সুর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাচিয়েদের শরীরে, সঙ্গে সঙ্গে নড়ে গেল নিতম্বের দিকটা, পায়ের দিকটাও নাড়া খেয়ে গেল সেই সুরের ঝাপটায়।

দীনেন দেখল সকলের মাঝখানে শাড়ি জড়ানো বীণাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গোপা তার শরীরটা ঝাঁকিয়ে মোচড়াচ্ছে। বীণার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে পাপড়ি থেকে শিশিরের ফোঁটা ঝরানোর মত করে সুরটাকে কোমর নিতম্ব বা পায়ের দিকটায় ফেলে দিচ্ছিল। আবার ঢেউ-এর মত সুর উঠে আসছিল উপরে, আবার নেমে যাচ্ছিল নীচে। সিগারেটের ধোঁয়া একটা সূক্ষ্ম পর্দার মত বীণা ও তার মাঝখানে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ডায়াসের উপর বাজিয়েদের দলের একজন ক্লাউনের মত ভঙ্গী করে দুলে দুলে প্রাণপণে দুটো হাত শূন্যে তুলে ম্যারকাশ বাজিয়ে চলেছে। সুরটা একটু একটু করে সবার মস্তিষ্কের ভেতরও প্রবেশ করছিল বলে দীনেনের তখন চারপাশে তাকিয়ে সকল কিছুকেই অলীক মায়াময় মনে হচ্ছিল। নিজের শরীরের ভেতর সে রক্তের দাপাদাপিটা স্পষ্ট টের পাচ্ছিল। একসময়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাজনাটা থামল।

নাচের আসরটা ছেড়ে দ্রুত টেবিলের কাছে এগিয়ে এল বীণা। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে, মুখ চোখের রঙ লাল।

—বাঃ তুমি যে এমন নাচতে পারো, জানা ছিল না তো ?

বীণা কিছু বলল না, হাঁফাতে হাঁফাতে চেয়ারটা টেনে বসল। কোমর থেকে জড়ানো আঁচলটা টেনে টেনে খুলে আঁচল দিয়ে নিজের মুখে হাওয়া করতে লাগল।

—উঃ নাচতো নয় ব্যায়াম। এক গেলাস জল চাও তো দীনেনদা, গলাটা শুকিয়ে গেছে। শরীরের কান্তিটা মুছে গেলেও বীণার গলায় যেন সেটা তখনও লেগে ছিল। ওর গলার স্বরের কম্পনটায় সেটা টের পাচ্ছিল দীনেন। হাসিমুখে সে বেয়ারাকে কাছে ডেকে এক গেলাস জল চাইল। আর টেবিলে জলের গেলাসটা রাখতেই বীণা টপ করে সেটাকে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল। তাড়াতাড়িতে ঠোঁট উপচে খানিকটা জল পড়ে বুকের কাছটা ভিজে গেল।

ভেতরের গুমোটটা কেটে ভেতরটা ফর্সা হয়ে আসছে। দীনেন বলল—কাপড়টা ভিজিয়ে ফেললে তো ? চল ওঠা যাক এখন।

বীণা চমকে উঠে দীনেনের চোখের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলে উঠল—ছিঃ।

সঙ্গে সঙ্গে নাড়া খেয়ে দীনেনের মাথাটা নীচু হলো।

বিলের পয়সা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে, রাস্তা-ঘাটে লোকজনের ভীড় কিছুটা কম। দীনেন আর অপেক্ষা করল না। স্কুটারটা ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামিয়ে স্টার্ট দিল, বীণা তার কোমর জড়িয়ে বসল তার পিছনের দিকটায়।

স্কুটারটা ফাঁকা রাস্তায় বেশ খানিকটা তীব্র গতিতে চলল। হাওয়া আসছে উদ্দাম, পিঠের উপর বীণার শরীরে। দীনেনের মনে হল সামনের রাস্তাটা যেন মাটি ছেড়ে উপরে উঠে আকাশ পর্যন্ত

ছুঁয়েছে। তার ভীষণ ইচ্ছে করল সেই সময় একবার অন্তত ঘাড় ফিরিয়ে বীণার ছ' চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে— আমাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত বা নিহত করে কি লাভ হল তোমার বীণা? এভাবে তুমি আমার এতকালের অহংকার ভেঙে দিলে কেন? কেন এভাবে তুমি আমার তুচ্ছ দুর্বল লোভা অস্তিত্বটাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে?

বোম্বাই থেকে দীনেনের ফেরবার কথা ছিল মাসখানেক পর কিন্তু ফিরলো দিন কুড়ি পরেই। ভেতরে চাপা ধরণের একটা ছটফটানি ছিল বলে ওখানকার কাজটা চটপট করে সেরে নিয়েছিল। বাড়ীতে পা দিয়েই টের পেল একটা থমথমে হাওয়া বইছে। রমাকে কেন্দ্র করে কি যেন একটা চলেছে। বিষয়টা সে ভাল করে বুঝতে পারল কি পারল না, স্নান খাওয়া সেরে অফিস চলে গেল। অফিসের ঘরগুলোয় নূতন রঙ করা হয়েছে, টেবিল চেয়ারে নূতন বার্ণিস, সব কিছু এখন ঝকঝকে তকতকে, একপলক তাকিয়েই দীনেনের ভালো লেগে গেল। তার নিজের ছোট ঘরটায়ও নূতন চেয়ার টেবিল শেলফ আর নূতন পর্দা, কার্পেট। অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ঘরটা। নূতন খেলনা পাওয়া ছেলেমানুষের মত বার কয়েক ঘরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখল দীনেন। নূতন টেবিল-গুলো হাত বুলিয়ে পরখ করল। তারপর কাজে হাত দিয়ে বাড়ির অস্বস্তিকর আবহাওয়া কথাটা আর মনে রইল না। নূতন রঙ ফেরানো ঘরে কাজ করতে তার বেশ ভাল লাগছিল। এক ফাঁকে লিলি এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে গেল তার ঘরে। শেষ পর্যন্ত গীটারের নাকি একটা অর্ডার জুটেছে। লিলিকে ভীষণ হাসি-খুশি আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ও চলে যেতে বোস সাহেব, রাঠোর সাহেব এলেন। দীনেনের ক্যালেণ্ডারগুলোর লে আউট দেখে পার্টি এমন খুশি হয়েছে যে অর্ডারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঐ

বাড়ীর অর্ডারের খুশিতে রাঠোরের ফর্সা মুখটা ঝলমল করছিল। বোস সাহেব তো ঘরে ঢুকে আনন্দে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ালেন খানিক। তারপর নূতন করে একপ্রস্থ কফি খাওয়া হল, দীনেনের ঘরে চতুর্দিকে সুখের হাওয়া বইছে, দীনেন ভাবল। হয়ত এই হাওয়া লেগে তার মনের সমস্ত ক্লেশ ধুয়ে মুছে যাবে। মনটা বেশ ঝরঝরে আর শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল। মনে মনে সে প্রার্থনা জানাচ্ছিল কারো কাছে আসা এই সুখ সময়টা যেন চিরস্থায়ী হয়। সকলের কথা মনে করেই দীনেন মনের প্রসন্নতাটা দানা বেঁধে উঠছিল। টিকিটের সময়টা হাতে নিয়ে দীনেন বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। সুনীলটার সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন। কাছাকাছি খবরের কাগজের অফিসে চাকরী করে ও। দীনেন সোজা লিফটে করে তেতালায় উঠে গেল। সুনীল তার নির্দিষ্ট চেয়ারেই বসেছিল। দীনেন যেতেই একমুখ হাসি নিয়ে বলল—কিরে কবে ফিরলি ?

তারপর বেশ খানিকটা সময় ধরে বন্ধু-বান্ধবদের খবর, সাহিত্যের খবর, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হল। সুনীলের বেয়ারাটাকে দিয়ে ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়ে লাঞ্চ সারল দিনেন। সুনীলের স্বভাবটা অদ্ভুত, বন্ধু বান্ধব ছাড়া একা কিছুই করতে পারে না, এমন কি খিদে পেলেও পেট চেপে বসে থাকে, কেউ এলে একসঙ্গে খায়। ওর ওই ভারী শরীরের মধ্যে কি যেন একটা লুকিয়ে আছে দীনেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কখনও সুনীলকে খুব ধড়িবাজ শয়তান বলে মনে হয় কখনও বা উদার স্নেহপ্রবল বন্ধুবৎসল কোন গভীর ধরণের মানুষ। দীনেন সময় সময় ভেবে দেখেছে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সুনীল তাকে যেমন তীব্রভাবে টানে, তেমনি ঘৃণা বা বিরক্তির বোধটাও জাগায়। সব মিলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র সুনীলের, এক সময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দীনেন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

অফিসে নিজের ঘরে ফিরে দীনেন আর দেরী করল না একফোঁটা। তোড়জোড় করে কাজে ডুবে গেল। দিনটাই ভাল

যাচ্ছিল বলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দু' দুটো কাজ পছন্দমত শেষ হল। আর ঠিক সেই সময় তার ঘরে এল শ্যামল।

প্রথমটায় বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল দীনেন। শ্যামল যে তাব অফিসে আসবে কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন আশা ছিল না। আর ভালোও লাগল বেশ।

আপনার কাজটা শেষ করুন আগে, আমার কথাগুলো বলতে কিছু সময় লাগবে। আমি ততক্ষণে পত্রিকাগুলো দেখি।

হাসিমুখেই বলল শ্যামল। দীনেন বেয়ারা দিয়ে চা আনিয়ে দিল।

দীর্ঘ হয়ে রোদ পড়েছে ঘরে। দীনেন কব্জি উল্টে দেখল সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর অল্প কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে পারলেই আজকের মত অফিস শেষ। একটা অস্বস্তি হচ্ছিল দীনেনের। তবু খানিকক্ষণ নূতন ডিজাইনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। মনটা কাজে আর ঠিক আগের মত ছিল না বলে, ছবি বা লেটারিংগুলো ঠিক মন পছন্দসই হচ্ছিল না। কাজটা জরুরী কিছু নয়, ধীরে সুস্থে করলেও চলে। তাই পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল সে।

অফিসের বাইরে পা দিয়ে তারা দেখল অফিস ফেরত জনতার ভিড়ে উপচে পড়ছে রাস্তাঘাট, ট্রাম বাসের প্রচণ্ড শব্দ চারপাশে লম্বাটে ব্রীজটা ঝুলে আছে গঙ্গার উপর। শ্যামল বলল—একটা নিরিবিলি রেস্তোরা দরকার প্রথমে।

—এই সময় কি তা পাওয়া যাবে। চলুন দেখি।

দীনেনের মনের ভেতর সন্দেহ ছিল, দু'একটা জানা দোকান, কফি-হাউস সব ঘুরেও একটা খালি চেয়ার পাওয়া গেল না। সব জায়গাই বিস্তর লোক। অফিস শেষের আড্ডা জমিয়েছে।

—কোন বারে যেতে আপত্তি নেই তো আপনার?

অপ্রস্তুত মুখেই বলল দীনেন একসময়।

—তাহলে আমার একটা চেনা দোকান আছে, এই সময়টা রোজ নিরিবিলি থাকে।

—আপত্তি, না কিছুমাত্র নয়। তবে কি জানেন, মদটা ঠিক ধাতে আমার সয় না। একবার খেয়ে বুঝেছিলাম। শ্যামলের কথায় দীনেনের মনের অস্বস্তিটা কেটে গেল।

তারপর দীনেনরা গিয়ে গলির ভেতর ছোটখাটো, ছিমছাম, জনহীন বারটায় ঢুকল। বেশ নিরিবিলি পরিবেশ। দু'একজন খদ্দের ছিটিয়ে আপন ভাবে বসে! এ বারটায় সাধারণত ধারে কাছের খবরের কাগজের পঞ্জিকা অফিসের কর্মিরাই আসে। আর নিয়মিত বাঁধা কিছু কাস্টমার আসে সন্ধ্যেবেলায়। মোটামুটি ভদ্র পরিবেশ। দীনেনরা কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

বড় বেশী নির্জন আর মন্থর আবহাওয়া বারটায় এখন।

কয়েকজন বয় ভেতরের দিকে মেঝের উপর বসে জটলা করছে কেবিনগুলো খালি। রিজার্ভড লেখা বোর্ডগুলো উল্টে ঝুলছে। শ্যামল বলল—মার অসুখের পর ডাক্তারবাবু অল্প করে ব্র্যাণ্ডি খাওয়ানোর কথা বলেছিলেন, দিদি একটা পুরো বোতলই কিনে এনেছিল! আমি আর বিশু একদিন ঠিক করলাম এ খেয়ে দেখতে হবে জিনিষটা কেমন? তা যা ভাবা সেই মত কাজ, বোতলটা নিয়ে খানিকটা করে জলের গেলাসে ঢেলে চোখ মুখ বুজে এক ঢোকে খেয়ে ফেললাম সবটা। কেমন যেন লাগল। কিন্তু তারপরই কিছুক্ষণ পর থেকে শুরু হল আমার বমি। একেবারে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার যোগাড়।

কথা শেষ করে শ্যামল হাসছিল।

সেই থেকেই মদের বিষয়ে মনে কেমন একটা ভয় ঢুকে আছে।

এই সময় নিঃশব্দে বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়াতে, দীনেন নিজের জন্য এক বোতল বিয়ার আর শ্যামলের জন্য কোকা কোলার অর্ডার দিল।

—একদিনের ঘটনাতেই এমন অমৃতটাকে বাতিল করলেন শ্যামলবাবু?

দীনেন বলল হাসতে হাসতে।

—আরে মশাই মনে একবার ভয় ঢুকে গেলে, অমৃতেও অরুচি হয় মানুষের।

শ্যামলের কথা বলার ঢঙে দীনেনও হেসে ফেলল।

—তা যা বলেছেন, ঐ ভয় জিনিষটাই বড় অদ্ভুত। মানুষকে কাবু করে দেওয়ার ব্যাপারে ওটির মত আর বড় শত্রু নেই কিছু।

তারপর কিছুটা সময় নীরবে কাটল ওদের। একসময় বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে দীনেন বলল—কি কথা বলবেন বলেছিলেন, শুরু করুন এবার। তবে দেখবেন মশাই, ঐ ভয়ের বিষয়ে কিছু বলবেন না যেন আবার।

হালকা গলাতেই কথা বলছিল দীনেন।

—আমি আবার একটু অন্য প্রকৃতির মানুষ কি না।

শ্যামল ধীরে সুস্থে কোকা কোলার গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। দীনেনের কথায় মুখটা এক নিমেষে কেমন গম্ভীর দেখাল যেন। দীনেনের চোখে পড়ল সেই পরিবর্তনটা।

—বলছি তবে কি জানেন, বিষয়টা একটু গোলমালে, কি ভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না।

আরে যে ভাবে পারেন শুরু করে দিন না একবার, তারপর দেখা যাবে।

অফিসে আসার পর থেকেই মেজাজটা হাল্কা ছিল বলে দীনেন বেশ সহজ ভাবেই বলল কথাটা।

শ্যামল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল না। বরং কেমন অন্যমনস্ক ভাবে হু'দণ্ড গেলাসটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল, চোখ নামিয়ে টেবিলের তলায় কি যেন দেখতে লাগল। দীনেন লক্ষ্য করছিল শ্যামলের মুখ চোখে গভীর ছায়া পড়েছে, ভেসে যাচ্ছে আবার। শরীরটাকে স্থির রেখে ভেতরের দিকে সূক্ষ্ম ভাবে কোন ধরণের একটা নাড়াচাড়া চলেছে তার। দীনেন বুঝতে পারছিল

শ্যামলের মত বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন কিছুকে শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে চেয়ে বিফল হচ্ছে। কিংবা কোন ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে দৃঢ় ও সাহসী হয়ে উঠতে পারছে না। কি এমন গভীর বিষয় হতে পারে যে নিয়ে শ্যামল অমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে? দীনেন ভাবল একপলক। তারপর গেলাসে বিয়ারের তলানিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সে বেয়ারাকে ডেকে আর একটা বোতলের অর্ডার দিল। ঘরের ভেতর ছায়া জমছে ফট্ ফট্ শব্দ করে ক্রাচ বগলে খোঁড়া একজন বেয়ারা ঘুরে ঘুরে আলোগুলো জ্বেলে দিচ্ছে। কাউন্টারে ঝুঁকে পড়ে বুড়ো মতন কালো টুপি পরা পার্শি মালিক একজন হিসেব করে চলেছে। কোন চেয়ার বা টেবিলের তলা থেকে একটা বেড়াল বিষণ্ণ গলায় ডেকে উঠল। মুখটা একটু তুলে দীনেনের দিকে সোজা তাকিয়ে শ্যামল বলল।

—একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি দীনেনবাবু। আমার রিসার্চের কাজটা শেষ হয়ে গেছে। এবার আমাকে ফিরতে হবে।

সেকি, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন কেন?

এখানে আমি কাজ নিয়ে এসেছিলাম, থাকতে আসিনি তো।

শ্যামল কেমন একটু উদাস হাসল।

—তাহলে।

—দীনেন বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছিল শ্যামলের কাজের কথাটা এগুলো নয়, অন্য কিছু গভীর গোপন ও ভিন্ন ধরণের কিছু। সে ভেতরে মৃদু একটা ছটফটানিও বোধ করছিল। এত সময় নিচ্ছে কেন শ্যামল তার বক্তব্যটি বলতে? সরাসরি কিছু বলছে না কেন?

—দীনেনবাবু আমি ভীষণ একটা সঙ্কটে পড়েছি রমাকে নিয়ে। ও একেবারে নাছোড়বান্দা, আমার সঙ্গে পাকিস্তানে যাবেই। অথচ—

মাথাটা চাগিয়ে নিয়ে মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শ্যামল কথা বলতে শুরু করলে দীনেন যেন পাথর হয়ে গেল। শ্যামলের

গলায় উচ্চারিত রমার নাম ছুটে এসে দীনেনের হৃদপিণ্ডে আঘাত করল আর তাতে মুহূর্তেই সমস্ত গতি ও চঞ্চলতা হারিয়ে দীনেন যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

অথচ ওকে কোন দুর্যোগের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে আমার মন একদম সায় দিচ্ছে না। আমি জানি ও কি ভীষণ কোমল, জোরালো কোন আঘাত ও সইতে পারবে না। আর পাকিস্তানে আমার জীবনটা একেবারেই সুখের নয় বরং সম্পূর্ণ উল্টো, সরকারী পরোয়ানা ঝুলছে আমার উপর। বিপদজনক পলাতক জীবন আমার, সেখানে তার মাঝখানে ওকে আমি নিয়ে যাই কেমন করে বলুন? অথচ এই কথাটা কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারছি না আমি।

থেমে ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলছিল শ্যামল, তার গলাটা ভারী, আর দীনেনের স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তখন। অথচ বুকের মধ্যে ঘূর্ণি ঝড়ের মত বাতাস বইছিল।

আপনি এ ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করুন দীনেনবাবু। আপনি একবার রমাকে বুঝিয়ে বলুন সব।

—আমি! আমি কি বলব?

কেমন আর্তস্বরে দীনেন কথা বললে শ্যামল তার দিকে তাকাল।

এখানে আমার বন্ধুর সংখ্যা খুব অল্প দীনেনবাবু! যে ক'জন আছেন তাদের মধ্যে আপনি একজন। তাই আপনাকেই বলছি। আর রমাও আপনাকে বিশ্বাস করে খুব। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ওকে।

অসহায়ের মত মুখ করে শ্যামল কথা বললে, দীনেন নিজেকে সামলে নিল খানিক, তারপর বলল।

—একটা কথা আমাকে বলুন শ্যামলবাবু, টানটা কি কেবল রমার দিক থেকেই আসছে? না···

—তা কেন, ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই দিক থেকেই সমান সমান। আর সেই জন্যই তো ওকে এই কথাগুলো বোঝাতে আমার

অসুবিধা হচ্ছে। ওকে সামনে রেখে এই বিচ্ছেদের মর্মান্তিক কথাগুলো আমার মুখ থেকে ঠিকভাবে বেরুতে চায় না। অথচ খবর এসেছে, পার্টি জোরদার একটা আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, ফলে এসময় তো আমি এখানে বসে থাকতে পারি না।

আলোছায়ার খেলার মত কথা বলবার সময় শ্যামলের মুখে চোখে বেদনার ও হাসির একটা টানাপোড়েন চলছিল। সেটা দীনেন লক্ষ্য করল।

—ভালোবাসার টানেও কি এপারে থেকে যেতে পারেন না আপনি ?

ইচ্ছা করেই একটু বাঁকাভাবে কথাটা বলল দীনেন।

—সেই জন্যেই তো পারি না। জীবনের বিশ্বাস বা লক্ষ্যবস্তুটা ভালোবাসার থেকে আলাদা কিছু কি দীনেনবাবু ?

—এগুলো সবই এক। আপনারা শিল্পী মানুষ, ব্যাপারটা আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন।

কথা বলবার সময় মলিন ধরণের একটু হাসল শ্যামল। তারপর দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস ফেলে দুদণ্ড চুপ করে থাকল। দীনেন একটা সিগারেট ধরালো।

—জানেন ব্যাপারটা আমার কল্পনার মধ্যেও আসেনি কখনও। রমাকে তার নিজের পরিবেশে তা দেখেছি। আমার নিত্য নূতন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালো লাগে, আর ওবাড়ির দিক থেকেও তেমন কোনো বাধা পাইনি। ফলে খোলা মনেই মিশে ছিলাম। কিন্তু যা অভাবনীয় ছিল তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। তবে একথা বিশ্বাস করুন দীনেনবাবু, আমার নিজের মনোভাবটা কিন্তু কোনো দিন জানতে দিইনি রমাকে। ওর দিক থেকে সাড়া না পেলে আমি নিজের বুকের ভেতর ব্যথাটা লুকিয়ে নিয়েই কিন্তু ফিরে যেতাম।

নিজের বুকের ভেতর দীনেন এবারে একটা চাপা বিষণ্ণতা অনুভব

করছিল। এতক্ষণ শূন্যতাটা ছিল বলে অনুভবের ক্ষমতাটা যেন খানিকটা ঢাকা পড়েছিল, শূন্যতাটা কেটে যেতে ব্যাপারটা মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। দীনেন শুনল বড় রাস্তা দিয়ে প্রবল শব্দে একটা দমকলের গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তায় কোন মোটর গাড়ীর কলকব্জার কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বলে গাড়ির হর্ণটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা বেজে যাচ্ছে। তার ভেতরে পথ চলতি মানুষজনের ভীড়ের ভেতর কারা যেন গলা ফাটিয়ে হো হো শব্দে হাসছে, ফেরিওয়ালার গম্ভীর গলায় 'ফল চাই' শোনা যায়। অবসন্নভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে দীনেন সিগারেট টানতে লাগল, গলা বুক ভরে ধোঁয়া নিল। কিছুক্ষণ আর কোন কথা হ'ল না। দুজনেই নীরব। অবশেষে শ্যামল বলল।

—মনটা এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে আমার ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, তবু আপনি কথা দিন আমার পক্ষ থেকে রমাকে আমার অসুবিধার কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করবেন। ওকে বলবেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা এখন তেমন ভালো নয়। যতদূর খবর পেয়েছি, তাতে মনে হয় সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যাণ্ড করে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

একেই তো আমার উপর পরোয়ানা ঝুলছে, তার উপর পার্টিকে ব্যাণ্ড করে দিলে তো ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। এধরণের বিপদ আপদ সইবার ব্যাপারে ওতো তেমন অভ্যস্ত নয়।

শ্যামল চাপা স্বরে গলগল করে কথা বলছিল। তার সমস্ত কথা যে দীনেনের কানে ঢুকছিল এমন নয়। তারপর শ্যামলের কথা শেষ হলে দীনেন কোনরকমে বলল।

—একবার চেষ্টা করে দেখব আমি।

বলতে বলতে তার বুকটা যেন খালি হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

ড্রইংরুমটায় পা দিয়েই দীনেন দেখল মুখোমুখি সোফায় বসে আছেন বিনয় কাকাবাবু আর কাকিমা, তুজনেই তারা নীরব। মুখ চোখের অবস্থা থমথমে, দীনেনের পায়ের শব্দে একটু নড়েচড়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন।

—বসো দীনেন, তোমার সঙ্গে আমাদের কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

—বলেই তিনি আড়চোখে তাকালেন স্ত্রীর দিকে, দীনেন প্রথমে একটু অবাক হল, পরে বুঝল বিষয়টা।

—একি হোলো বলতো দীনেন, ভালোমানুষ দেখে ছেলেটার সঙ্গে মেয়েদের মিশতে দিয়েছিলাম আর তার প্রতিদানে আমাদের এমন সর্বনাশটা করল তোমার বন্ধু।

কাকিমার গলায় উষ্ণতার ঝাঁঝটা ফুটল। দীনেন মাথা নীচু করে বসে রইল। এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে? সর্বনাশ কি আর শ্যামল ঘটিয়েছে, রমার কি এ ব্যাপারে একফোঁটাও দোষ নেই?

—ছ্যাখো ছেলেটির সম্বন্ধে ভালো করে জানিও না আমরা কিছু। পাকিস্তানে বাড়ি, সেখানেই আবার ফিরে যাবে শুনছি। এদিককার ছেলেটেলে হ'লেও না হয় আমরা খানিকটা ভেবে চিন্তে দেখতে পারতাম। কিন্তু ওর বিষয়ে কিছু ভাবনা চিন্তারও তো আমাদের কোনো উপায় নেই।

তা ছাড়া জেনেশুনে মেয়েকে তো আমরা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

—অথচ তোমার মেয়ে জেদ ধরে বসেছে, তাতে কি করা যাবে?

কি করা যাবে মানে? মেয়েকে জোর করে আটকে রাখবো

বাড়ীতে, আর ঐ ছোঁড়াটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো? দেখি তাতে শায়েস্তা হয় কিনা।

ঘুরে বসলেন কাকিমা। রাগে ভদ্রমহিলার সমস্ত শরীর কাঁপছে, নিজের স্বাভাবিক সৌজন্য বোধটাও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

—সবদিক ভালো করে ভেবে দেখে কথা বলো। মেয়েদের তোমার বয়স হয়েছে, জোর করে আটকে রাখতে চাইলেই কি আর পারবে?

—যে করেই হোক কাজটা করতেই হবে আমাদের, আমি জীবিত থাকতে এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেবো না। নো—নেভার, যেন ক্ষীপ্তের মত লঘু চোখের চেহারা নিয়ে কাকিমা বললেন।

দীনেন কোন কথাই বলতে পারছিল না। সমস্ত কিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে কোন রকমে বলল সে।

—একবার রমাকে সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে বললে হয় না?

—তুমি কি ওকে তেমন ভাবছো নাকি, ও কোনো কথাই শুনবে না। ভীষণ গোঁয়ার, যা ধরেছে সেটা করেই ছাড়বে। বাইরে থেকে দেখতেই অমন শান্ত শিষ্ট, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ জেদী।

—তবুও একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

—দীনেন কিছু না ভেবেই বলল—তা কী আর বাকী রেখেছি ভেবেছ। ওকে কদিন ধরে তো আমরা বোঝানোর কম চেষ্টা করে দেখিনি। কিন্তু কোন ফল ফলছে না। রাগে ক্ষোভে ভদ্রমহিলার মুখটা গন্‌গনে দেখাল। ও একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

—শুধু অন্ধ নয় মাথারও গোলমাল হয়েছে ওর। তবে আমিও একথা বলে রাখলাম তোমাকে দীনেন, যতদূর সম্ভব বাধা আমরা দেব। তার জন্য যদি নিজেদের লোক সমাজে ছোট করতে হয়, তাতেও পিছ পা হবো না।

দীনেন চুপ করে থাকল, কেমন আড়ষ্ট বোধ করতে লাগল সে। বুকের ভেতর কেমন একটা হাওয়া বইছে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার হাওয়া। দীনেন কোনকিছু যেন আর ভাবতে পারছিল না। খানিক চুপ করে থেকে বিনয়বাবু বললেন—

—তা তুমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো না দীনেন। মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে পারো কি না?

কাকিমা কিছু বললেন না দেখে, দীনেন আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠল। তারপর সিঁড়িতে পা রেখে খানিকটা সময় ইতস্ততঃ করল। কি বলবে সে রমাকে? কেমন করেই বা বলবে? ওর সঙ্গে কোন গভীর কথা বলতে গেলে কি আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে?

দোতালায় রমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আর একবার ইতস্ততঃ করল। তারপর আঙুলের টোকা দিল দরজায়। কোন সাড়া পাওয়া গেল না প্রথম। মনের অস্বস্তিটার জন্য হাতের আঙুলগুলো এমন অবশ নিষ্ক্রিয় হয়েছিল যে, দরজায় জোরে টোকা দেওয়া যাচ্ছিল না। এবারে দীনেন কড়া ছুটো ধরে নাড়ল।

—কে?

ভেতর থেকে রমার গলা শোনা গেল।

—আমি।

—ও দীনেন! এসো, দরজা খোলা আছে।

খাটের ওপর মুখে বালিশ চাপা শুয়েছিল রমা, দীনেন ঘরে ঢুকতে অগোছাল শাড়ি সামলে উঠে বসল। মুখ চেপে জলের দাগে ভেজা কেমন একটু কৃশ আর মলিন দেখাচ্ছিল রমাকে।

—এ সময় শুয়ে কেন! শরীর খারাপ নাকি?

—না এমনি।

দীনেন চেয়ারটা টেনে খানিকটা খাটের পাশ ঘেঁষে বসল।—তোমার সঙ্গে আমার ছু'একটা জরুরী কথা আছে।

জানতাম, সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে যখন, তখন তোমার পালা। মলিন মুখে আবছা মতন হাসল রমা।

—মা দেখছি ভালো একজন উকিল পাঠিয়েছে।

রমার গলায় বিদ্রুপটা ঝলসে উঠলে, দীনেন মাথা নীচু করল।

—না, তুমি ভুল করছ, তোমার মা আমাকে পাঠাননি। শ্যামল পাঠিয়েছে। অত্যন্ত ধীর গলায় দীনেন কথাগুলো বললে, রমা আর কিছু বলল না। বরং একটু যেন সলজ্জ ও উৎসাহিত দেখাল তার বিপর্যস্ত মূর্তিটা। কিভাবে নিজের বক্তব্যটা উপস্থিত করবে প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভেবে ঠিক করতে পারছিল না দীনেন। পরে শ্বাস ফেলে বলল। তুমি কি পাকিস্তানে যাওয়ার বিষয়ে একেবারে মনস্থির করেই ফেলেছ।

—ওর বাড়ী যখন ওখানে, যেতেই হবে আমাকে। বেশ সহজ ভাবেই কথাটা বলল রমা।

রোজ খবরের কাগজ যখন পড়ো, তখন এটা নিশ্চয়ই জানো, ওখানে একটা দুর্যোগ চলছে এখন। কেমন জ্বালা জ্বালা করছে শরীরের ভেতর। দীনেন সেটা স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিল।

—তা চলতে পারে, কিন্তু তাই বলে যাওয়াটা আটকাবে না আমার।

রমা শাড়ীর আঁচলে একটা গিঁট বাঁধবার চেষ্টা করছিল। গিঁটটা ঠিকমত বাঁধা হচ্ছিল না। খুলে খুলে যাচ্ছিল।—কিন্তু তুমি কি একথাটা জানো, পাকিস্তানে শ্যামলের জীবনটা তেমন নিরাপদ নয়। ওর উপর সরকারী পরোয়ানা ঝুলছে।

—জানি।

—জেনে শুনেও তুমি বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো।

রমা চোখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে রইল ঘরের দেওয়ালটার দিকে।

দীনেন দেখল তার দুই চোখ জলে টলটল করে উঠল, অন্ধকার

মেশান চোখের তারায় কোথা থেকে যেন একটা আলোর আভা লাগলো। আলো ফুটে উঠলো। এবার দীনেনের বুকের মধ্যে গর্জে উঠল যেন একটা ঝড়। চোখের দৃষ্টিটা আলো হারিয়ে অন্ধকার হয়ে যেতে থাকল, সমস্ত দৃশ্যই ঝাপসা মতন। বহু দূরে গুম গুম শব্দ করে একটা ট্রেন যেন ব্রীজ পেরিয়ে যাচ্ছে। দীনেন কোন রকমে মরীয়ার মত বলল।

—একটা ছুটন্ত মানুষকে ধরবার জন্য ছুটাছুটি করাটা ছেলেমানুষী। ওতে তুমি সুখী হবে না রমা।

—সুখ!

—আমার কাছে ঐ সুখ শব্দের ব্যাখ্যাটা একটু ইলাসটিক্ দীনেনবাবু! টেনে টেনে ওটাকে আমি অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।

হাসতে হাসতেই কথা বলছিল রমা। তারপর কথা শেষ করে সে উঠে দাঁড়ায় বিছানা ছেড়ে। ঘরের দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থামল একটু। ঘাড় ফিরিয়ে দীনেনের মুখের সোজাসুজি তাকিয়ে বলল আবার।—বন্ধুকে বলবেন আমি নিজের বোঝাটা নিজের কাঁধেই রাখতে জানি। বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সোজা।

আর দীনেনের চোখের ভেতর, শরীরের ভেতর একটা তীব্র ব্যথা মুচড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর নিঃশ্বাসের থলিটা এতক্ষণে জমতে জমতে ফেটে পড়ল যেন। দীনেন তার ঝাপসা দৃষ্টিটা তুলে শুধু দেখতে পেলো, রমা তার কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপর দু'দণ্ড পরে বোধটা ফিরে এলো, চমকে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল দীনেন শূন্য ঘরে চেয়ারে বসে, আর ঘরের চৌকাঠের পাশে স্থির মূর্তির মত বীণা দাঁড়িয়ে। বীণা এ ঘরে কখন এলো, দীনেন প্রথম বুঝতে পারল না। পরক্ষণে সচেতন হয়ে উঠে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বীণার দীকে তাকিয়ে, শ্লেষের হাসিটা হেসে বলল—না তোমার দিদিকে কিছুতেই বোঝানো গেল না।

বীণা কিছু বলল না। শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার গোড়ায়। দীনেন দেখল বীণার দু'চোখের দৃষ্টি ভীষণ উজ্জ্বল। যেন পুড়ে যাচ্ছে। অবাক হল সে।

—কি, কি হয়েছে তোমার বীণা ?

এবারে যেন নাড়া খেয়ে একটু ছটফট করে উঠল বীণার স্থির অচঞ্চল মূর্তিটা। তারপর দীনেন সতেজ হয়ে উঠবার আগেই ঘর ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটা দরজা বন্ধের শব্দ শুনল সে তারপর। তবে কি বীণা রমার উদ্দেশ্যে বলা আর আর্ত নিবেদনটা শুনতে পেয়েছে! বন্ধ দরজার কাঁপানো জোর শব্দটা যেন ভেঙে আছড়ে পড়ল দীনেনের বুকের উপর।

॥ আট ॥

রমার গৃহত্যাগের চিঠিটা পাওয়ার পর বাড়ীর উদ্বেগ অশান্তিটা চরমে গিয়ে পৌঁছুল। রমার ব্যবহারে দীনেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার যেন ক্ষীণ একটা আশা ছিল, অমন শান্ত দুর্বল রমা তার মত পরিবর্তন করবে। অথচ সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপারটা ঘটল। দীনেন ভাবতে পারছিল না কিছু। হাতে চিঠিটা পেয়ে, এতদিনের সংযম-শীলতার কথা ভুলে যেন কাকিমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বীণাকে দীনেন দেখতে পাচ্ছিল না কোথাও।

সে তার নিজের ঘরে ছিল, অফিস যায়নি। বিনয় কাকাবাবু এলেন। ক্লান্ত অবসন্ন দেখাল ভদ্রলোককে, ঘরের চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে তিনি বললেন।

—একি হলো বলোতো দীনেন। খুকীর মত অমন শান্ত স্বভাবের মেয়ে কিনা শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

বিনয়কাকাবাবুর গলায় বেদনা, বিরক্তি আর উদ্বেগের আভাস পাচ্ছিল দীনেন।

তোমার কাকীমা কিছুতেই শুনছেন না আমার কথা। কিন্তু আমার কেবলই যেন মনে হচ্ছে দীনেন, খুকী হয়ত জীবনে খুব ঠকবে না, বরং স্বামীর ঘরে ও শান্তিতে থাকবে। কেন যে মনে হচ্ছে আমার, তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দীনেন এবার কাতর গলায় বলল—আমার জন্যই এমন কাণ্ডটা হতে পারল। কি রকম যে লাগছে আমার।

—তোমার কি দোষ বল। তুমি তো ভালো ভেবেই শ্যামলকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে ওদের সঙ্গে। আর এটাও ঠিক, আমিও

তো শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, সত্যি চোখে পড়বার মত ছেলে ও। কথা বলবার সময় মলিন একটু হাসি ফুটল বিনয়কাকা-বাবুর মুখে।

—কার জন্যে কে আছে জানি না। তবে দীনেন, পারলে তুমি একবার ওদের খোঁজ খবর নিও। তোমার কাকিমা তো ভীষণ ভেঙে পড়েছেন।

বলতে বলতে তিনি খোলা দরজার দিকে এগুলেন—একবার থমকে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশটা দেখে নিয়ে বললেন।

—বছর খানেক এদিককার ঘরগুলো রঙ করা হয়নি। আমি কালই সরকার বাবুকে বলে দিচ্ছি, দেখে শুনে সব ব্যবস্থা করে নিও।

বলতে বলতে বাগানের পথে নামলেন।

দীনেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল সাইকেল চেপে বিমল আসছে। ওর চোখে মুখে কেমন চাপা একটা উত্তেজনা। সামনে আসতে না আসতেই তড়বড় করে নেমে পড়ল সে।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। শ্যামলদার রেজেষ্ট্রী হবে বিকেলে। দেবব্রতের বাসায় বালিগঞ্জে, আপনি কিন্তু মনে করে যাবেন।

চাপা আর কেমন এক ধরণের ষড়যন্ত্রের গলায় কথা বলছিল বিমল। দীনেন অনুভব করল।

—রমাদি বার বার আপনাকে যেতে বলে দিয়েছেন, ওর পক্ষের সাক্ষী হবেন আপনি।

বলতে বলতে বিমল পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বাড়িয়ে দিল। দীনেন কিছু বলল না নীরবে সম্মতি জানিয়ে কাগজটা পকেটে রাখল।

সমস্ত দুপুর তারপর দীনেনের বিষণ্ণতার অস্বস্তির ভেতর কাটল। ছায়া কেটে বাইরে পরিষ্কার উজ্জ্বল রোদ আসে, ঝরঝরে হাওয়া, তার মনে ভরে থাকে চাপা ক্ষোভ ও অস্বস্তি। রোদ পড়ে এলো

দীনেনও বাড়ীতে গেল। উদ্দেশ্য ছিল বিয়ে বাড়ীতে যাবার আগে গোপনে একবার বীণাকে সব জানিয়ে যাবে।

বারান্দায় উঠে দেখল সামনের ড্রইং রুমটা ফাঁকা, বীণার ঘরের পর্দা সরিয়ে তাকে সেখানেও দেখতে পেল না দীনেন। সিঁড়ির মুখে ডাঃ দাসের সঙ্গে দেখা, কালো ব্যাগ হাতে অন্য একজন ভদ্রলোক সঙ্গে। দীনেন বুঝতে পারছিল না। ডাঃ দাসকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল সব। মেমসাহেব কাকিমার নয়, বীণারই অসুখ। আজ দু' দিন ধরে বীণার দেখা পাচ্ছিল না দীনেন। আর বাড়ীতে বিভিন্ন সব অশান্তি চলছিল বলে, সে তেমন খোঁজও নেয়নি ওর।

দোতলায় সিঁড়িতে পা দিয়েই দীনেন ভাঙা অদ্ভুত ধরণের একটা গলার স্বর শুনতে পেল। গলা তুলে বীণা যেন সামনে কাকে ডেকে চলেছে। ওর গলার স্বরটা এমন অদ্ভুত লাগল দীনেনের কানে যে, এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝ সিঁড়িতে।

তারপর শোবার ঘরের পর্দা সরিয়ে বীণাকে দেখামাত্র দীনেনের দৃষ্টিটা চমকে উঠল। তার মনে পড়ছিল দু'দিন আগে রমার ঘরে শেষবার সে বীণাকে সুস্থ অবস্থায় দেখেছিল। আর এমন এলোমেলো চুলে আঁচল লোটান অবস্থায় ও অপ্রকৃতিস্থ মুখ চোখের ভাবটা লক্ষ্য করে কিছুটা অস্বস্তি হল তার। ঘরের মধ্যে এলোমেলো পায়ে পায়চারি করছিল বীণা। কাকিমা খাটের উপর স্থাণুর মত বসে, বিনয় কাকাবাবুকে দেখা যাচ্ছিল না ঘরে।

দীনেন কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেও বীণা যেন ঠিক তাকে দেখতে পেল না। কাকিমা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

—বীণা!

—কে? ওঃ—দীনেনদা!

দীর্ঘক্ষণ দীনেনের দিকে তাকানোর পর বলল।

—তোমার কি হয়েছে বীণা! জ্বর?

—জ্বর

ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল বীণার। খালি খালি জ্বর হতে যাবে কেন আমার। কিছু হয়নি।

দীনেন কি বলবে বুঝতে পারছিল না। তার মস্তিষ্কের ভেতর সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। চাপ চাপ রক্তের ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাস যেন ফেঁপে ফুলে উঠছে, দীনেন বলল।

—বোসো বীণা।

—কেন, বসব কেন ?

ঘরের মাঝখানে যেন ফণা তুলে দাঁড়াল বীণা।

—তোমরা আমাকে নিয়ে মজা করছ, না ? আমাকে নিয়ে মজা ···মজা, না ?

—তোমার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে বীণা! বোসো।

দীনেন দেখল কাকিমা তার চোখে চোখে কি একটা ইংগিত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দীনেন তার ইংগিতের অর্থটা ধরতে পারল না।

দীনেন লক্ষ্য করল, বীণা তার কথামত অত্যন্ত শান্ত ধীর ভঙ্গিতে গিয়ে খাটের উপর বসল। সেও চেয়ারটা সরিয়ে বীণার পাশে জায়গা করে নিল। দীনেন অনুভব করতে পারছিল তার সমস্ত শরীর মন যেন পুড়ে যাচ্ছে, বীণা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে। তার চাহনিটা যেন দীনেনের ভেতর পর্য্যন্ত ঢুকে দেখতে পাচ্ছে ? অসহায় দীনেন মুখটা নামিয়ে নিল! বীণার ব্লাউজের বোতামগুলো খোলা, ব্লাউজটা ঢলঢলে হয়ে ঝুলছে দুটো ডানার মত, লোটানো আঁচলটা তুলে দীনেন তার শরীর ভালো করে ঢেকে দিল। জীবনে এই প্রথম সবচেয়ে মহৎ আর সবচেয়ে সাহসের কাজটা করছে সে, অনুভব করতে পারছিল দীনেন। এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীণা।

—তুমি কি আমাকে ভালবাসো যে গায়ে হাত দিলে ?

দীনেনের দিকে তাকিয়ে আচমকা ভয়ংকর গলায় চেঁচিয়ে উঠল

বীণা। আর দীনেনের শরীরের সমস্ত স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল! এক নিঃশেষে যেন সে দেখল দেবী মূর্তির একজোড়া চোখ জ্বলছে, তার মুখের উপর দেবীর বিশৃঙ্খল কেশপাশ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, দেবীর অস্ত্রহীন নগ্ন দুটি বাহুতে প্রবল শক্তি ও সংহার স্থির হয়ে আছে। নিকট থেকে দেবীর দৃষ্টি যেন বড় নিশ্চিতভাবে দীনেনের সমস্ত কিছু দেখে নিচ্ছে।

—বিশ্বাস করো বীণা, তোমাকে ছাড়া আমি জীবনে কোনো মেয়েকে এমনভাবে ভালবাসিনি।

—আমি জানি তুমি দিদিকে লুকিয়ে রেখেছ। সত্যি কি না বলো? বিড় বিড় করল বীণা।

—না, তা সত্যি নয় বীণা! তোমার দিদি শ্যামলের সঙ্গে গেছে। জিজ্ঞাসা করো তোমার মা বাবাকে।

—সত্যি বলছ?

—সত্যি।

অনেকক্ষণ পর বীণাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, দীনেন যখন নিচে নেমে এল, তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। বাড়িতে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। তারপর ড্রইংরুমে পা দিয়ে দেখল বিনয়-কাকাবাবু টেবিলে বোতল, জার, গেলাস সাজিয়ে একা বসে আছেন। দীনেনের পায়ের শব্দে তিনি মুখ তুলে বললেন—

—ঘুমুলো শেষ পর্যন্ত?

দীনেন কিছু বলল না।

ডাক্তার বলল—নার্ভাস ব্রেক ডাউন। মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে এমন হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই।

॥ নয় ॥

ওষুধ খাইয়ে দিন দেড়েক ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল বীণাকে। ঘরের জানালা কপাট বন্ধ, পা চেপে চেপে হাঁটা চলা করা হচ্ছিল। দীনেন কেবল লক্ষ্য করছিল বিনয় কাকাবাবুকে। এই দিনকয়েকেই কেমন হয়ে গেছেন তিনি। সারাদিন বীণার খাটের পাশে বসে। রাত জেগে অসুস্থ মেয়ের পরিচর্যা করছেন। সেই বেপরোয়া বিশৃঙ্খল ভদ্রলোকটি যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। এমন আশ্চর্য পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।

দীনেনের মধ্যে তখনও বিভিন্ন এলোমেলো বিশৃঙ্খল সব চিন্তা বুদ্বুদের মতন উঠছিল, কিন্তু দীনেন সেদিকে তেমন মনোযোগ দিচ্ছিল না। ক্রমশঃ সিগারেটটা শেষ হল। তৃষ্ণায় ঠোঁট গলা শুকিয়ে আছে, জ্বালা জ্বালা করছে। দীনেন টেবিলে ঢাকা দেওয়া গেলাস তুলে জল খেল, খেয়ে একবার বাথরুমে ঘুরে এল বিনা প্রয়োজনেই। ফিরে এসে ঘড়িতে দেখল বেলা পাঁচটা বাজে। আর হাতে বেশী সময় নেই, সাতটায় ট্রেন।

যে উৎপীড়ন যাচ্ছে তাতে খুব শীগগীর যে ভেঙে পড়বে। এই সত্যটা যতই স্পষ্ট হচ্ছিল, শরীরের অবসাদটা ততই বাড়ছিল, দীনেনের।

ঠিক সময় দীনেন গিয়ে ষ্টেশনের ঘড়িটার তলায় দাঁড়াল। শ্যামলরা এল একটু দেরীতে। শ্যামল, রমা আর বিমলের দল।

ট্রেন আসতে বিমলের দল হৈ হৈ করে কামরায় একটা অংশ দখল করে নূতন সতরঞ্চি পেতে ফেলল। রমাদের ফুল আঁকা টিনের সুটকেসটা রাখল গুছিয়ে।

ঘণ্টা দিয়ে ট্রেনটা ছাড়তে দীনেন ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেল।

সিগারেটের ধোঁয়া তার স্নায়ুকে শান্ত ও স্বাভাবিক করছিল। জ্বালাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে আসছে।

এবার দীনেন বলল—আমাদের দেশেই থেকে গেলে পারতেন শ্যামলবাবু। লোক যে আমরা মন্দ নই তাতো বুঝতেই পারছেন। কথা বলবার ফাঁকে দীনেন একবার রমার দিকে তাকালো।

—না লোক আপনারা ভালো, তবে নিজের দেশ ছেড়ে থাকি কি করে বলুন ?

—আপনাদের দেশে এসেছিলাম কাজ নিয়ে। তেমন বড় কিছু পাওনার আশা ছিল না। কিন্তু আপনারা আমায় ঝুলি ভরে দিলেন। ব্যাপারটা দেখছি শেষ পর্যন্ত মন্দ দাঁড়ালো না। অনেকটা নাটক নভেলের নায়কের মতই হয়ে গেল।

—তা খানিকটা ঠিকই বলেছেন, এলেন, দেখলেন আর জয় করে নিয়ে গেলেন। এমন ভাগ্য নায়কদেরও বড় সচরাচর দেখা যায় না।

মনে রাখবার মতন দিন বড় একটা আসে না আমাদের জীবনে। অন্ততঃ আমার জীবনে তো কখনই নয়। তবু আপনি এসেছিলেন বন্ধুত্ব হয়েছিল, মনে থাকবে চিরদিন।

বাতাসে রমার আঁচল উড়ে দীনেনের হাতে লাগছিল। দীনেন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। এখনও আকাশে চাঁদ ওঠেনি।

কাঁধের উপর মৃদু নাড়া খেয়ে তারপর চোখ চেয়ে দেখল সামনে শ্যামল দাড়িয়ে।

—এসে গেছি, চলুন।

দীনেন ধড়পড় করে উঠে দেখল গাড়ীটা অদ্ভুত নির্জন একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। সবে ভোর আকাশে গাছ পালায় তখনও আবছা মতন অন্ধকার লেগে। পাতলা আলো খানিকটা ফুটেছে যেন। ষ্টেশনে নেমে চারপাশ তাকিয়ে জায়গাটা মন্দ লাগল না তেমন। শ্যামল টিনের সুটকেস আর সতরঞ্চিটা গুটিয়ে নিয়ে নেমে এলো, রমা নামল তার পেছনে পেছনে। অল্প স্বল্প লোকজনের চলাফেরা

আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। ষ্টেশনের সীমানার বাইরে কয়েকটা খড়ের চালের মিষ্টির দোকান। শ্যামল হাঁটতে হাঁটতে আঙুলে তুলে একটা দিক দেখাল। বেনাপোল। পাকিস্তানের সীমান্ত।

শ্যামল ওদের নিয়ে একটা চেনা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে থেকে দোকানের ভেতর মানুষজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। শ্যামল গলা তুলে ডাকল।

—ও হারাধন! হারাধন!

বারকতক ডেকে চুপ করল সে। তারপর দীনেনের দিকে তাকিয়ে বলল।

তীর্থস্থানে যেমন পাণ্ডা আর এই ব্যাকের পথে তেমন দালাল। দুজনেরই কাজ এক, নির্ঝঞ্ঝাটে আসল জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

দীনেনের সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। একটা মৃদু উত্তেজনাও বোধ করছিল সে। দোকানের ভেতর থেকে যেন একজন মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। ঝাঁপ তুলে বেরিয়ে এলো সে।

—কে?

—আরে কত্তা আমি। এদিকে শোনো দেখি একটু।

বলতে বলতে লোকটাকে নিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় শ্যামল। দীনেনের পাশ ঘেঁষে রমা দাঁড়িয়েছিল।

দীনেন বলল।

—কি, ভয় করছে নাকি?

—তাতো একটু করছেই।

দীনেন রমাকে দেখছিল, ওর টানা টানা চোখের পাতায় খানিকটা খুশী লেগেছিল যেন, সুন্দর গভীর নির্মল দুটো চোখ পাতলা রেশমের মতন চুলের বোঝা আর শিথিল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরের চারপাশ ঘিরে একটা মায়ার সৃষ্টি হচ্ছে। সম্মোহিতের মতন হৃদয়ের কোনো আবেগের তাড়নায় দীনেন রমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল, তারপর শ্যামল এল, রমা বলল।

—কি, ব্যবস্থা হ'লো কিছু ?

—সেকি ব্যবস্থা হবে না কেন, হারাধন সহায় যখন, কোন সীমান্ত পুলিশ আমাদের কি করে রুখবে ? চল, আর দেরী নয়, ভোর ভোরই খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক।

বলতে বলতে দীনেনের দিকে তাকিয়ে এক পলক হাসল শ্যামল। তারপর চোখে চোখে তাকিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরল।

সত্যি দীনেনবাবু আপনার কাছ থেকেই আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহারটি পেলাম। আপনি আমার সবচেয়ে বড় সুহৃদ। চলি এবার।

বলতে বলতে গলাটা যেন একটু ধরে এলো তার।

শ্যামল একটু এগিয়ে গেল রমার দিকে। দীনেনকে এক পলক তাকিয়ে দেখল সে। তারপর বলল।

—চলি দীনেন।

বলে ও মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দীনেনের মনে হলো বুকের ভেতর থেকে কোনো যন্ত্রণা ফুঁপে উঠতে চাইছে, গলার কাছটায় কান্নার মতন লাগছে। সমস্ত শরীরটা যেন এই মূহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এই মানুষের পৃথিবীর কোনো শব্দ বা ভাষা মনে পড়ছিল না দীনেনের। বুকের ভেতর কেমন বজ্রপাত ও রক্তের কালো ছোপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

—বিশ্বাস করো দীনেন, তোমাকে গ্রহণ করবার মতো শক্তি ছিল না আমার। আমি বড় দুর্বল আমাকে ক্ষমা করো।

ফিস্ ফিস্ করে কথা ক'টা বলে দ্রুত পায়ে শ্যামলের দিকে এগিয়ে গেল রমা। দীনেন রেলষ্টেশনের লোহার বেড়াটায় পিঠ দিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার নিথর চেতনার উপর দিয়ে একজোড়া আলতা পরা পা ধীরে ধীরে দূরের দিকে চলে যেতে লাগল। দীনেনের শরীর শুধু সেই পদপাতের প্রতিধ্বনিতেই আলোড়িত হতে থাকল।

॥ দশ ॥

দিনদু'য়েক পবে পরাস্ত শোকগ্রস্ত ছিন্নভিন্ন-স্নায়ু মানুষটিকে সারা রাত্তির বহন করে এনে ট্রেনটা শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে দিল। দীনেন চোখ মেলে দেখল সব। তার চোখের সামনে শুধু কেবল দেওয়ালের পর দেওয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেওয়ালের গায়ে কারা যেন চক্ দিয়ে দীনেনের বিষয়ে কিছু লিখে রেখেছিল। চক-খড়িব লেখাগুলো অস্পষ্ট ঝাপসা মতন, দীনেন যেন সেখানে পড়তে পারছিল, লেখা রয়েছে জরুরী নিষেধাজ্ঞা! সাবধান! সাবধান! দীনেন আস্তে আস্তে ষ্টেশনের এলাকা ছেড়ে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। জল-কুলিতে রাস্তা ভিজিয়েছে, মানুষজনের মুখ চোখ নির্মল পবিত্র দেখাচ্ছে। আমি এখানে কেন? দীনেন ভাবল। ভাবতে ভাবতে ভেতরের শিরা উপশিরা দিয়ে গরম রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকলো। সে 'বাড়ী বাড়ী' মনে মনে ঐ সংকেতময় শব্দ দু'টিকে বার কয়েক অস্ফুটে উচ্চারণ করে বলল, আবার উচ্চারণ করল।

তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। অথচ গতকাল ঘুমে ঘুমে তার চেতনাটা প্রায় অন্ধ হয়ে ছিল মনে পড়ল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গেট ঠেলে বাগানের ভেতর পা রাখতে ভালো লাগল। চতুর্দিক জুড়ে রোদ্দুর পড়েছে। দীনেন দেখল বাগানের ভেতরটা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বীণার কথা মনে পড়ল। বীণা কেমন আছে? হা ঈশ্বর! ওর তো কোনো দোষ ছিল না? দীনেন দ্রুত বারান্দায় উঠে সামনের ড্রইংরুমটার ভেতর পা রেখে দেখল সোফার মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছে কাকিমা, বিনয়কাকাবাবু একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। দীনেনের

মনে হল ওরা যেন কোন সংবাদের প্রতীক্ষা করছেন ? তার পায়ের শব্দে দুজনেই চম্‌কে উঠে তাকাল দীনেনের দিকে।

—ও তুমি ! আমি ভাবলাম কে ! কখন এলে ? বলতে বলতে কাকিমার গলার স্বরটা আটকে গেল বীণার জন্য।

দীনেন বলল—বীণা কেমন আছে ?

—ওকে কাল হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি পারো একবার দেখা ক'রো আজকে। আগের চেয়ে অনেক ভাল।

দীনেন বেরিয়ে পড়ল।

* * * *

হাসপাতাল।

বীণা বললে—তোমার আশাতে আমি এতক্ষণ পথ চেয়েছিলুম। আমি জানি তুমি আসবে।

—কেন এ প্রতীক্ষা বীণা ?

—কারণ তুমি আশা না দিলে আমার আর বাঁচতে সাধ নেই।

দীনেন ধীরকণ্ঠে বললে—তুমি সেরে উঠলেই তোমার বিয়ের ফুল ফুটবে বীণা ! এবারে আর আমি দেরী করব না।

—ঠিক ত ?

—নিশ্চয়।

বীণাকে একটু আদর করে দীনেন পথে বেরিয়ে এলো।

দীনেন বাড়ির পানে চলল। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। নীড়মুখী পাখীদের কাকলি শোনা যাচ্ছে। তারা বোধহয় নীড়ের সাধ পেয়েছে।

দীনেন হাসল।

ওদের জীবনে কি বিয়ের ফুল ফুটলো ? লজ্জায় তার মুখটা লাল উঠল।